বিপ্লব সংখ্যা

গণদাবী

প্রধান স[illegible]দক—সু[illegible]ব্যানা[illegible]র্জী [illegible]এল,এ

সোস্যালিষ্ট [illegible]উনিটী সেণ্টারের বাংলা [illegible]পত্র ([illegible]ক্ষিক)

৫ম ব[illegible] সংখ্যা | [illegible]ক্রবার, ৭ই নভেম্বর ১৯৫২, ২১[illegible] কার্তি[illegible] | মূল্য[illegible]র আনা

★ শান্তি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য ★

[গত ২রা অক্টোবর হইতে চীনদেশের পিকিং সহরে অনুষ্ঠিত সারা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিকট ভারতের শান্তি আন্দোলনের বর্ত্তমান ধারা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই স্মারকলিপিটি পেশ করেন—উক্ত সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের প্রতিনিধি কমরেড সুবোধ বন্দোপাধ্যায়।]

আমাদের দেশের, তথা এশিয়ার শান্তি আন্দোলনের দিক বিচার করিয়া, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আমাদের শান্তি আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অভাবগুলি আপনাদের নিকট উপস্থিত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আশা করি, নিজ নিজ দেশের শান্তি আন্দোলনের পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কমরেডগণ বিষয়টি গ্রহণ করিবেন এবং ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে সংশোধন করিয়া একটি শক্তিশালী শান্তি আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন। কম্যুনিষ্ট হিসাবে আমরা এশিয়ার শান্তি সৈনিকদের এবং আমাদের দেশের ও বাহিরের কমরেডদের কাছে আবেদন করিতেছি, তাহারা যেন এই সমালোচনাকে আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে গ্রহণ করেন। জাতীয় ক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধান করিতে বারবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াই আমরা সারা এশিয়ার শান্তি আন্দোলনের উচ্চতম সংস্থার নিকট বাধ্য হইয়াই ইহা পেশ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আপনারাও ইহাকে যথাযথ দৃষ্টিতে গ্রহণ করিবেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী পৃথিবীর সামাজিক শক্তিগুলিকে দুইটি পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও নীতির ভিত্তিতে মূলগতভাবে বিভক্ত করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনতার শিবির সোভিয়েট ইউনিয়ন, প্রজাতন্ত্রী চীন এবং অন্যান্য জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের নেতৃত্বে সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে স্থায়ী শান্তি, জনতার গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করিতেছে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিষ্টরা নিজেদের অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট সংকটের হাত হইতে সাময়িক রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধের মারফৎ প্রচুর মুনাফা লুটিবার মতলবে, প্রগতিশীল জনশক্তিকে ধ্বংস ও সমগ্র পৃথিবীকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, একচেটিয়া শোষণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া চলিয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বাধাহীন বিস্তার লাভ করা এবং "রুটির বদলে গুলি" এই পুরানো ফ্যাসিষ্ট নীতির অনুসরণ করিয়া ব্যাপকভাবে সমর সজ্জার প্রতিযোগীতা চালান। ইহারা দুর্বল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের ও উপনিবেশ সমূহের কাঁচা মাল ও অন্যান্য জিনিষ লুঠ করিবার সর্বপ্রকার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীব্যাপী বিমান ঘাটি ও নৌ ঘাটীর সৃষ্টি মারফৎ সেইগুলিকে আগামী যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া শান্তিপ্রিয় জনতার উপর আর একটি বিশ্বযুদ্ধ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অন্ধ দেশাত্মবোধ (chauvinism) ও যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং স্বরাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপর নির্য্যাতন ও ভীতির (Terrorism) সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধ প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করাই বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য। এই অভিসন্ধি ইচ্ছাকে বিস্তৃততর করিতে যাইয়া প্রতিটি রাজ্যে ধনিকগোষ্ঠী তাহাদের এতদিনের অনুসৃত উদারতার মুখোসটুকুও খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং ধনবাদী গণতন্ত্রের মধ্যে যে সামান্যতম অধিকার মানুষ উপভোগ করে, তাহাও হিংস্র উপায়ে হরণ করিয়া ফ্যাসীবাদীদের মত নগ্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ফ্যাসীবাদ মৃতপ্রায় ধনতন্ত্রেরই স্বাভাবিক পরিণতি। একদিকে যেমন ধনতন্ত্রী শাসকগোষ্ঠী নির্মমভাবে নিজ নিজ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পিষিয়া মারিতেছে, সমস্ত প্রকৃত গণতন্ত্রকামী, শান্তিকামী জনতাকে কঠোরভাবে দমন করিতেছে এবং বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিতেছে, তেমনি অপরদিকে আবার ওয়ালষ্ট্রীটের যুদ্ধবাজদের নেতৃত্বে সমস্ত শক্তিকে সংহত করিতেছে।

এই শেষোক্ত নীতিই ব্যক্ত হইয়াছে মুমূর্ষু চিয়াংকাইশেককে পুনরুজ্জিবিত করিয়া নয়া গণতন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে জোরদার করার মাকিনী নীতি এবং হিটলার এর দোসর দেশোদ্রোহী গুপ্তচরদের নিজের দেশ বিকাইয়া দিবার মধ্যে। নাৎসী সেনানায়ক, যাহারা দুষ্কার্য্যের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের সহায়তায় নাৎসী সংগঠনগুলিকে পুনরায় সংগঠিত করা, প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রাঙ্কো সরকারকে সমর্থন করা ও জাপানকে পুনরস্ত্রীকরণের মধ্য দিয়া তাহাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশে আপন শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্যই উপনিবেশের বুর্জোয়াদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়াছে এবং সেই সব দেশের বুর্জোয়াদের বিশ্বপুঁজিবাদী নেতৃত্বের অধীনে আনিয়া জনতার মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এইভাবে ওয়ালষ্ট্রীট, ডাউনিং ষ্ট্রীট এবং তাহাদের ধামাধরা শক্তিগুলি শান্তি শিবিরের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানিবার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি সংহত করিতেছে।

কোরিয়ায় আমেরিকান অভিযান—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রস্তুতির এক নূতন রূপ। ফ্যাসিষ্টদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা আর শুধুমাত্র ষড়যন্ত্র বা আক্রমণাত্মক চুক্তির ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। এখন তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। যুদ্ধ এখন বাস্তব সত্য। কোরিয়ার যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত করার সর্বপ্রকার চেষ্টাই সাম্রাজ্যবাদীরা করিতেছে। কিন্তু একথা ইহাই প্রমাণ করে না যে—যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইহা নিঃসন্দেহে সত্য যে যুদ্ধবাজদের আতঙ্কিত করার মত শক্তি শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকামীরা অর্জন করিয়াছে এবং এই সতর্ক ও সক্রিয় শান্তিকামী শক্তিই বিশ্বশান্তিকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা করিতে পারে। "যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই"—একথা ভিত্তিহীন; পরন্ত ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যতই অধিকতর সংকটের সম্মুখীন হইবে ততই হিংস্র সামরিক অভিযানে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তাই মার্কিন সামরিক চক্র বারবার প্রজাতন্ত্রী চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চীন ও সোভিয়েটের নিরপরাধ জনতার উপর নির্মমভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছে এবং পুনঃপুনঃ তাহাদের যুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছে। তাহারা ফরমোসায় বর্বরোচিতভাবে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে অঘোষিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালাইয়াছে। সর্বোপরি চীন ও কোরিয়ার অধিবাসীদের উপর অমানুষিকভাবে জীবাণু বোমা প্রয়োগ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার জলন্ত প্রমাণ স্থাপন করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্ব আছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতবর্ষ সহ এশিয়ার শান্তি আন্দোলনকে বিচার করিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে এক আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের শান্তি-আন্দোলনের নেতারা কি লেখায় কি বক্তৃতায় যুদ্ধের অনিবার্য্যতাকে নগণ্য রূপে প্রকাশ করায় যুদ্ধ হইবে না এই ধারণারই সৃষ্টি হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিশ্বব্যাপী এই হীন উদ্দেশ্যকে একমাত্র শান্তিকামী জনশক্তিই ব্যর্থ করিতে পারে। গত বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা এবং ধ্বংসের স্মৃতি এখনো জনতার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাহারা স্বাভাবিকভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে চায়। তাহারা ইহাও জানে যে যুদ্ধ মানেই দারিদ্র্য, অনাহার, দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাপক নরহত্যা। সুতরাং তাহারা আর ধনিকদের কামানের খোরাক হইতে রাজী নয়। ধনিক শাসক গোষ্ঠী সদম্ভে জনতার এই ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ সুরু করিয়াছে এবং তাহাকে বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিতেছে। শান্তি আন্দোলনের সৈনিকদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হইতেছে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গণশক্তিকে একটি গণতান্ত্রিক মোর্চায় সংহত করা।

জনতার যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবই যথেষ্ট নয়, পরন্তু সেখানে হইতেই আন্দোলনকে সুরু করিতে হইবে। যদি বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শান্তি আন্দোলনের মধ্যে এই যুদ্ধ বিরোধী চেতনা সংহত করা না যায়, শেষ জড়তা দূরীভূত না হয়, "ধনিকরা প্রকৃত হটুক আমরা যুদ্ধের সময় শেষ আঘাত হানিব"—এই সুবিধাবাদী নীতির মূল উৎপাটিত করিয়া, জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে নিজেদের শক্তিশালী সংগঠনের মধ্য দিয়া দেশের সর্বত্র যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু না করে, তবে সাম্রাজ্যবাদীদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করা যাইবে না। কাজেই শান্তির আন্দোলন হইবে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক গণ আন্দোলন।

শান্তি-আন্দোলনে অংশ গ্রহনকারী শক্তিসমূহ

যে কোন দেশের শান্তি-আন্দোলনকে যদি সত্যিকারের শান্তি আন্দোলনে রূপ দিতে হয় তবে শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে রাজী এমন সমস্ত শক্তিকে ইহার মধ্যে সংহত করিতে হইবে। ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক মতবাদ বা দলের কর্মী নির্বিশেষে যাহারাই শান্তির প্রকৃত সমর্থক তাহাদিগকে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংহত করিতে হইবে। সাংগঠনিক অবস্থাকে তুচ্ছ না করিয়া, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, যুবসংগঠন, নারীসংগঠন শিক্ষা ও কৃষক; ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক,

(শেষাংশ ১২র পৃষ্ঠায়)

ভার পাকিস্থান সম্পর্ক

চক্রের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ৭এর ১৫ই আগষ্ট একটি কালো দিনের না করেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সন ও শোষণ চিরতরে অবসানের অত্যুগ্র আকাঙ্খায় ভারতের জনগণের অশেষ আত্মত্যাগ দেশীয় মালিক ও জমিদারদের স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধনিক মালিক জমিদারদের দেশীয় জনগণকে শোষণের ক্ষেত্রে যে স্বার্থের সংঘর্ষ ছিল—বিদেশী শাসনের আমলে যা একদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বে নিজেদের শাসন ও শোষণ কায়েম করার জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে (আপোষ ও সংস্কারপন্থার মধ্য দিয়ে) বিরুদ্ধতা করেছে, অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়া ধনিক গোষ্টি ও জমিদারদের নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিদেশী শাসকদের 'বিভেদ ও শাসন' নীতির পরিপোষক হয়ে নিজেদের শাসন ও শোষণ কায়েম করার জন্য আত্ম নিয়োগ করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিরাট ওলোট পালোট হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শোষণের পুরানো কায়দা তাতে ভোল পালটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কায়েম রাখার জন্য আর সরাসরি রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নয়—তাতে ধনিক শ্রেণীর বিশ্বব্যাপী জোটে ফাটল আনে। তাই সাম্রাজ্যবাদ অগ্রনী হয়ে ঔপনিবেশিক ধনিক গোষ্ঠীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণের অধিকার রক্ষার অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে। সাম্রাজ্যবাদের এই নীতি গ্রহণের পেছনে মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রাম স্তব্ধ করে দেওয়ার অপকৌশল ও ঔপনিবেশিক ধনিকদের কোলে টেনে নেওয়ার অভিসন্ধি পুরোমাত্রায় কাজ করছে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর এই কথারই সাক্ষ্য দেয়। উপরন্তু ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর অখণ্ড ভারতে শ্রেণী শোষণের একাধিপত্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। যে দ্বন্দ্ব হিন্দু ও মুসলমান শোষক শ্রেণীর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সীমাবদ্ধ ছিল—রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশ বিভাগ করে হস্তান্তরের ফলে তা রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ভারতের ধনিক শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে 'হিন্দুস্থানের' রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছেন আর মুসলীম লীগ নেতৃত্ব ধনিক শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব করেছেন। দেশ বিভাগের সময় কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ সারা ভারতের জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকবেন বলে। ক্ষমতা লাভের পরে সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে যেতে নেতাদের একদিনও সময় লাগে নি।

দীর্ঘ দুই শত বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় জনসাধারণ যে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশীদার হওয়ার আশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল—দেশীয় ধনিক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথে মিলিত চক্রান্ত তা ব্যর্থ করে দিল—এই ব্যর্থতা সম্ভব হল মুলতঃ জনসাধারণের চেতনার অভাবে, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের অভাবে, গণতান্ত্রিক শক্তির অন্যান্য দলের বিভ্রান্তি ও বিভেদের ফলে। '৪৭এর ১৫ই আগষ্টের তথাকথিত স্বাধীনতা ইহারই বিষাক্ত প্রতিধ্বনি।

১৫ই আগষ্টের তথাকথিত স্বাধীনতা এমনি ক'রে ভারতের হিন্দু মুসলমান পুঁজিবাদী মালিক মহাজন ও জমিদার-নবাবদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠীত করল। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব তার স্বকীয় রূপ, দেশীয় ধনিক-মালিক শ্রেণীর প্রকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বে নিজেদের জাঁকিয়ে তুলল। যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় কাটিয়ে তোলার পরিবর্ত্তে দেশের জনসাধারণের উপর নিত্য নূতন করভার চাপিয়ে শোষণের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়েই তুলল। শোষণের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে যেখানেই প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশ পেল তাকে স্তব্ধ করে দিতে নিয়োগ করলো ভাড়াটি পুলিশ আর মিলিটারী; জনসাধারণের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আবার এক দুর্যোগ নেমে এলো। শ্রমিক, কৃষক, গরীব জনসাধারণের বিক্ষোভও দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এলো। সুরু হল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ। কংগ্রেসী নেতৃত্বের প্রকৃত স্বরূপ চিনে নিতে জনসাধারণ দেরী করল না। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের স্বরূপ উদঘাটন ক'রে যে হুসিয়ারী দিয়েছিল—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জনসাধারণকে তা মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিল।

অন্যদিকে পাকিস্থানের জনসাধারণ অল্পদিনের মধ্যেই টের পেল ইসলামের নামে ধর্মবিদ্বেষ ছড়িয়ে যে শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ তাদের উদ্দেশ্য নয়, মুষ্টিমেয় জমিদার নবাব ও ধনিক মালিকের স্বার্থেই তাদের স্বার্থ। মুসলমান চাষি জমির মালিকানা হতে বহুদূরে, শ্রমিক কল-কারখানায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও রোজগারের পথ পায় না, ছাত্র শিক্ষার সুব্যবস্থার পরিবর্তে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত, গরীব মধ্যবিত্ত শাসকদের জোয়ালে জীবন পাত করেও দারিদ্রের হাত হতে রক্ষা পায় না। ছাটাই ও বেকারী দেশের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। গণতান্ত্রিক ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার জনসাধারণের নাগালের বাইরে।

পাকিস্থানের গণ আন্দোলন

অন্ধ ধর্মবিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতার বিষ হাতে নিয়ে যে পাকিস্তান সরকার জন্ম নিয়েছে—জনসাধারণের চেতনার অভাব ও সজ্যশক্তিহীনতার সুযোগ নিয়ে তাও বেশী দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই 'ভাষার আন্দোলনে' প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মুসলমান ছাত্র ও যুবক সমাজ সেদিন এগিয়ে এসেছিল পূর্ব পাকিস্থানের রাজপথে, পাকিস্থানী পুলিশ আর আনসার বাহিনীর লাঠি ও বন্দুক অগ্রাহ্য করে। রাজপথের রক্ত লাল করে পাকিস্থানের মুসলমান ছাত্র ও যুবক কসম খেয়েছে মুক্তি আন্দোলনের, আজও বহু গণতান্ত্রিক নেতা ও সংগঠক কারাপ্রাচীরের অন্তরালে মুক্তি যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছে। প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্থানী সাম্প্রদায়িক সরকারের সমস্ত চিন্তা আজ আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান রোধের উপায় উদ্ভাবনে দিশেহারা। পঙ্গু ও ঘুনেধরা সামন্ততান্ত্রিক ধনবাদী ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য দেশীয় শাসকরা ছুটছেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কাছে আশ্রয় ও রক্ষার ব্যবস্থার জন্য।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে হিন্দু ও মুসলমান ধনিকদের যে বাণিজ্যিক সংঘাত এতদিন একই দেশের সাধারণ মানুষকে এক ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের ঘৃণ্যভাবে উত্তেজিত করতে এবং ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের বলি হিসেবে ব্যবহার করতে এরা কেহই পিছায়নি—আজ দেশ বিভাগের ফলে তা দুই রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিদ্বেষ ও বিরোধের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। উভয় রাষ্ট্রই নিজ নিজ শোষণ ও শাসনে বিক্ষুব্ধ জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য কোন অজুহাতই হাত ছাড়া করতে নারাজ। তাই একদিকে যেমন নিজ নিজ দেশের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে পরস্পর ব্যবসা বানিজ্যের সম্পর্ক গড়ছেন আবার সেই স্বার্থের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট। কাশ্মীর সমস্যা ইহারই প্রতিচ্ছবি।

ভারত ও পাকিস্তানের বিভাগ সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে হওয়ার ফলে আজ রাষ্ট্রিয় শক্তির ক্ষমতাও বাণিজ্যের সামান্য তিক্ত সম্পর্ক ও বিরোধ সাম্প্রদায়িক আকার না নিয়ে পারে না, আর তার সবটুকু বিষ উজাড় করে ঢেলে দিতে চায় উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের গহ্বরে। যাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে নিজেদের দৈনন্দিন জীবিকা ও গণতান্ত্রিক জাগ্রত আন্দোলন হতে দূরে সরে গিয়ে শাসকশ্রেণীর শোষণের দিনগুলি আর একটু বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের সংঘর্ষ যদি উভয় দেশের জনসাধারণের তথা সংখ্যালঘুদের জীবনে বিপর্য্যয় না আনতো তবে ধনিকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দের পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার কথাই সর্বাগ্রে উঠতো। সংঘর্ষ তো বহু দূরের কথা, সামান্য তিক্ততাও যেখানে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি' করে, সংখ্যা লঘুদের ভিটে মাটি ছাড়া করে এবং পরিনামে উদ্বাস্তু সমস্যা এক জাতীয় সমস্যার পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ায়। ভারত বিভাগের সময় হতে এই উদ্বাস্তু সমস্যা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কংগ্রেসী নেতাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এক জলন্ত দৃষ্টান্ত এই বাস্তুহারা সম্প্রদায়। বাস্তুহারাদের পূনর্বাসন ও জীবিকার সংস্থানের পরিবর্ত্তে জাতীয় অর্থভাণ্ডার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকার। ভারতের অন্যান্য মূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মত উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানেও একই অক্ষমতা ও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন মহাজন মালিকের ও জমিদারদের পোষ্য কংগ্রেসী সরকার।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার বন্ধ করার জন্য পাকিস্থান সরকার ছাড়পত্র বা পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্ত্তণের জল্পনা কল্পনা সুরু করেন—আর উভয় রাষ্ট্রের ভিতর অবাধ যাতায়াতের (নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তির অন্যতম মূল সর্ত) পথে কড়াকড়ির ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ। উভয় বাঙ্গলার মধ্যে আবার নূতন করে ভিটেমাটি ছাড়ার পালা সুরু হয়ে যায়। একটা অজানা আতঙ্কে সাধারণ মানুষের মন দিশেহারা হয়ে ছুটে চলে দেশ হইতে দেশান্তরে। নবাগত বাস্তুহারার দল আসার পরে সমস্যা সমাধাণের ক্ষমতা না থাকলেও পূর্ববঙ্গ হ'তে হিন্দু মুসলমান

★ অর্থনৈতিক অবরোধ বাতুলতারই নামান্তর

নির্বিশেষে উদবাস্তদের আগমনে বাধা দেওয়ার কোন ফন্দিই যখন টিকল না—পাকিস্থান সরকারের ছাড়পত্র প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবের মধ্যেই দায়িত্ব এড়াবার হদিশ পেলেন সেয়ানা কংগ্রেসী সরকার। এরপর পাকিস্থান সরকার একমাসের জন্য পাসপোর্ট প্রবর্ত্তনের প্রশ্ন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানালেও কংগ্রেসী সরকার অগ্রণী হয়ে পূর্বনির্দ্ধারিত দিনে ১৫ই অক্টোবরই পাসপোর্ট প্রবর্ত্তন করে উদ্বাস্ত আগমন বন্ধ করলেন। কংগ্রেসী নেতাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাকিস্থানে বিদ্বেষে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায়—পাকিস্থানের অপকীর্ত্তি প্রচারে উঠে পরে লাগলো জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি।

অবরোধ পরিকল্পনার ধ্বজাধারী কারা ?

পাকিস্থানের অপকীর্ত্তি প্রচারের অন্যতম বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘ ও এ ব্যাপারে নিঃচেষ্ট নয়। পাকিস্থান বিরোধীতা ও জঘন্য সাম্প্রদায়িকতাই এদের একমাত্র পুঁজি। ভারতের হিন্দু জমিদার ও ধনিকশ্রেণীর এক বিশেষ অংশদ্বারা এই প্রতিষ্ঠান গঠিত—বিগত নির্বাচনে পরাজিত, জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই প্রতিক্রীয়াশীলদের সাম্প্রদায়িক উসকানী ও দাঙ্গা এমনকি গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্র প্রভৃতি কার্য্যকলাপ এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। নবাগত উদ্বাস্ত সমস্যার সম্মুখে তাই আবার এরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। এই প্রতিক্রীয়াশীল সাম্প্রদায়িকদের শিরোমণী হচ্ছেন ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী। দেশবিভাগের পরবর্ত্তী প্রথম ভারতীয় মন্ত্রী সভার ইনি এক জন ভূতপূর্ব মন্ত্রী। দেশ বিভাগ মেনে নিতে তখন এঁদের এতটুকু বাধিনি। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আজ ইনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হ'ল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পাকিস্থান বিরোধী অভিযান—যার পরিণতি পাকিস্থান অধিকার করে ভারতীয় হিন্দু জমিদার ও ধনিকদের শোষনের ক্ষেত্র বিস্তৃতি এবং এরই মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করা। সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রীয়াশীল রাজনীতিজ্ঞদের মুখপত্র হিসেবে তাই ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী দাবী তুলেছেন পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে পূর্ববঙ্গের সংখ্যা লঘুদের রক্ষা করার জন্য।

এ প্রসঙ্গে দু'চারটে কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাসপোর্ট প্রথা চালু করার কিছুদিন পূর্বেই পশ্চিম বঙ্গে উদ্বাস্ত আন্দোলন পুনর্বাসনের দাবীতে এক ব্যাপক আকার ধারণ করছিল বিভিন্ন বাস্তহারা সংগঠন গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনে সংগঠিত করে; আর পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাতেই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, কমিউনিষ্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, ডিমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড, বলশেভিক পার্টি, সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি, বামপন্থী দল-সমূহ একযোগে তা প্রত্যাহারের দাবীতে আন্দোলনের আহ্বান জানায়। উভয় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাসপোর্ট প্রথা প্রত্যাহারের দাবীতে এক বিরাট জনসভাও অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪ই অক্টোবর বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঐ সমস্ত বামপন্থী দলের মিলিত উদ্যোগে।

১৪ই আগষ্টই বিকেলে প্রজা সোস্যালিষ্ট দলের নেতা ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী আর একটি সভা আহ্বান করেন পৃথকভাবে বাস্তহারা সমস্যা সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য পুরাতন সোস্যালিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কার্য্যালয়ে। সভায় ডিমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড, বিপ্লবী সাধারণ তন্ত্রী, ওয়ার্কাস এণ্ড পিজেন্টস্ লীগ, আর, স, পি, (পান্না দাশগুপ্ত) প্রমূখ দলগুলি ছাড়া বাংলা দেশের সমস্ত বামপন্থী দল এবং প্রজা সোস্যালিষ্ট ও জনসংঘ-হিন্দু মহাসভাকেও ডাকা হয়। এই সভাতেই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অবশ্য এ প্রস্তাবে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ও কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া সবাই ইতিপূর্বে ঘরোয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রস্তাবের মারাত্মক পরিণতির কথা বিবেচনা করে এবং সভায় অংশ গ্রহনকারীদের মধ্যে কংগ্রেসত্যাগী প্রজা সোস্যালিষ্ট ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা-জনসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের যোগদান প্রভৃতি বিচার করে এস, ইউ, সি, ও সি, পি, র প্রতিনিধি মিলিত ভাবে দাবী করেন আর একদিন অন্ততঃ চিন্তা করে সমস্ত বামপন্থী দল সমূহকে সুচিন্তিত অভিমত দিতে। বহু তর্ক বিতর্কের পরে এ দাবী স্বীকৃত হয়। পরের দিন বৈঠকে সি, পি, র প্রতিনিধি পত্র দ্বারা উক্ত প্রস্তাবের সাম্প্রদায়িক চরিত্র বিশ্লেষণ করে উহা প্রত্যাখ্যান এবং নূতন ভাবে পাক-ভারত সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবণের আলোচনার জন্য সবাই মত করলে অংশ গ্রহণ করবেন বলে জানান। আর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার হ'তে একটি বিকল্প প্রস্তাবে পাসপোর্ট প্রথা প্রত্যাহার ও বাস্তহারার পুনর্বাসনের দাবীতে এক গণ আন্দোলনের পথে উভয় সরকারকে বাধ্য করার জন্য বামপন্থীদের ঐক্য গড়ার আহ্বান জানান হয়। সভায় সাম্প্রদায়িক নেতা ডাঃ মুখার্জী সভাপতি রূপে সমস্ত বামপন্থীদের অভিমত ঐ 'অর্থ নৈতিক অবরোধের' পথেই জানানোয়—এস, ইউ, সি'র প্রতিনিধি বামপন্থীদের নিজস্ব অভিমত তাঁদের মুখ থেকেই শুনতে চান। বামপন্থী নেতারা 'গণ আন্দোলন' তো অবশ্যই করতে হবে প্রভৃতি কথার আড়ালে 'অর্থনৈতিক অবরোধের' সাম্প্রদায়িক জীগিরে সায় দেওয়ায় এস, ইউ, সি'র প্রতিনিধি সভা ত্যাগ করেন।

অবরোধে কাজ না হ'লে যুদ্ধ !

'অর্থ নৈতিক অবরোধের' দ্বারা পাকিস্থানকে সোজা করার কথা যাঁরা বলছেন তাঁরা একথা ভাল ভাবেই জানেন, কোন সরকারকে অর্থ নৈতিক চাপে বাগ মানানো যায় না, আর তাই তারা পরবর্ত্তী ধাপ হিসেবে 'প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে পাকিস্থান জয়' করার কথাও বক্তৃতা প্রসঙ্গে এখনই বলতে সুরু করেছেন। যুদ্ধের কথা একটু পরে আলোচনা করা যাবে। অর্থ নৈতিক অবরোধের ফলাফলই সর্বপ্রথম বিচার করা যাক। অর্থ নৈতিক অবরোধের ফলে যদি পাকিস্থানকে সংহত করা যেত বা ভারত সরকারের পুজিবাদী কাঠামোর কোন ক্ষতির সম্ভাবনাই না থাকতো ত, ভারত সরকারও এ প্রস্তাব সর্বাগ্রে মেনে নিতো। ভারতের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব যারা হাতে করে নিয়েছেন সেই সরকার নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থের খাতিরেই আজ তা গ্রহণ না করে নিজেদের অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য 'অবরোধ' আন্দোলনে পরোক্ষ সহায়তা করে চলেছেন—জাতীয়তাবাদী কাগজগুলিই তার প্রমাণ।

অর্থ-নৈতিক অবরোধের পাণ্ডারা পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করে জানিয়েছেন পাকিস্থানের জনগনের বিরুদ্ধে নাকি তাদের কোন জেহাদ নেই, আর এর মারফৎই তাঁরা পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবেন। প্রস্তাবটি এমনই হাস্যকর যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষই তাতে সায় দিতে পারবেন না। কেননা পূর্বের বিশ্লেষণ থেকেই একথা পরিষ্কার বোঝা গেছে যে পাকিস্থান সরকারের যে রূপ তাতে ভারত সরকার দ্বারা অর্থ-নৈতিক অবরুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক বিস্তার করে পাকিস্থানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধবাজদের ঘাটি স্থাপন করতে দ্বিধা বোধ করবে না। দ্বিতীয়তঃ, যে গণতান্ত্রিক শক্তি পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ জাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছিল তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার সুবিধাও এতে বিশেষ করে পাবে পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িক সরকার। দেশবাসীর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এখনই পাকিস্থান সরকার দেশ বাসীকে আহ্বান করবে ইসলামের নামে ভারত সরকার তথা হিন্দুদের অবরোধ ও আক্রমনের হাত হতে পাকিস্থানকে রক্ষার মহান কর্ত্তব্যে। আর গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহকে সমূলে ভারতের হিন্দুদের দালাল বলে উৎপাটিত করতে। এর জের গিয়ে পড়বে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর। তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবেন 'অর্থনৈতিক অবরোধের, পাণ্ডারা কি দিয়ে? উপরন্তু এই 'অবরোধ' করতে হবে ভারত সরকারকে। যে ভারত সরকার অগণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থ-বিরোধী কার্য্যকলাপে দী পাঁচ বৎসর হাত পাকিয়েছে—নিরীহ ভারতীয় জনতার রক্তে যাঁদের কলঙ্কিত ইতিহাস পাকিস্থানের সরকার থেকে কোন দিক দিয়েই জনসাধারণের কাছে নিরাপদ নয়। ভারতের পুজিবাদী সরকার অর্থ-নৈতিক অবরোধ যদি করেই—করবে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে নয়। তাই ভারত সরকারের কাছে ভারতীয় পুজিপতি রাষ্ট্র নায়কদের স্বার্থে সেই 'অবরোধের' প্রস্তাব জনসাধারণ বা কোন গণতান্ত্রিক শক্তি ভুলেও উত্থাপন করতে পারে না। তা ছাড়া জন সাধারণের প্রতিদিনকার জীবন যেখানে ভারত ও পাকিস্থান সরকার দ্বারা সমানভাবে বিপর্য্যস্ত সেখানে এ রাষ্ট্র চক্রের কোন একটিকে দিয়ে অন্য রাষ্ট্র অবরোধ বা দখলের প্রশ্ন আর যাই হোক জনগণের স্বার্থের সাথে কোন দিক দিয়েই সম্পর্ক যুক্ত নয়—কোন স্বার্থই জনতার নেই এরূপ সাম্প্রদায়িক জীগিরের সাথে। উপরন্তু পুজিবাদী ও প্রতিক্রীয়াশীল শক্তি সমূহের স্বার্থেই একমাত্র 'অবরোধের' প্রশ্ন উঠতে পারে এবং উঠেছেও সেইখান থেকেই।

অবরোধ পরিকল্পনার বিশ্লেষণ

অর্থ-নৈতিক অবরোধের প্রশ্ন কিছু নূতন নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে অর্থ-নৈতিক

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

★ নভেম্বর বিপ্লব ★

নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য

নভেম্বর বিপ্লব দুনিয়ার মেহনতী জনসাধারণের এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ার শ্রমজীবি জনসাধারণ বলশেভিক পার্টীর নেতৃত্বে যে বিপ্লব সফল করে; দুনিয়ার শোষিত নিপীড়িত জনগণের অভ্যুত্থানের ইতিহাসে—ইহাই প্রথম শ্রমিক শ্রেণীকে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ ভূ-খণ্ডে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রুশ শ্রমিক শ্রেণী নভেম্বর বিপ্লবের মারফৎই এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠণ করিয়া শোষনহীণ ও শ্রেণীহীণ সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। মানব সমাজের উত্থান পতনের ইতিহাস—শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস। সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়াই মানব সমাজ ধাপে ধাপে আগাইয়া চলিয়াছে। ইতিপূর্বে যতগুলি বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে বিপ্লব সফল হইলেও শোষণের অবসান হয় নাই; শাসন ব্যবস্থার কর্ণধার হিসাবে এক শ্রেণীর শোষকের পরিবর্তে নূতন আর এক শোষক শ্রেণী আত্ম প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছে; পুরাতন ধরনের শোষণের পরিবর্তে নূতন আর এক ধরনের শোষণ কায়েম করিয়াছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরে সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ক্রীতদাসদের মুক্তি সংগ্রাম, ভূমিদাসদের বিদ্রোহ; বিগত শতাব্দির বিখ্যাত গণতান্ত্রিক বিপ্লব—সব গুলিই সেই একই পরিণতির সাক্ষ্য দেয়। অন্য সব বিপ্লবের সাথে নভেম্বর বিপ্লবের মূলগত পার্থক্য এই যে, এতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বিপ্লবই এক শাষক ও শোষক শ্রেণীর পরিবর্তে অন্য আর এক শাষক ও শোষক শ্রেণীর শোষণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজ প্রগতির স্তরে স্তরে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ অক্ষুন্ন রাখিয়াছে—নভেম্বর বিপ্লবই সর্বপ্রথম মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের চির সমাপ্তি ঘটাইয়া, এক শোষনহীণ শ্রেণীহীণ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। এইখানেই অন্য সব বিপ্লবের সাথে নভেম্বর বিপ্লবের মূলগত পার্থক্য।

নভেম্বর বিপ্লব ভৌগলিক সীমারেখার দিক দিয়া রুশ দেশে সংঘটিত হইলেও ইহার তাৎপর্য্য রুশীয় সীমানা অতিক্রম করিয়া সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সামন্ত প্রভূ, জমিদার ও পুঁজিপতিদের শোষণের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ধণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়া সামগ্রিকভাবে ধনতন্ত্রের ধ্বংশের যুগকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। উপরন্তু পরাধীন জাতি সমূহের বিশাল অংশকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়া সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় বিপ্লবের সম্মুখে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। বুর্জোয়া জাতীয়তার মুখোস ছিঁড়িয়া, এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদের নিজের দেশ ও তাহার ঔপনিবেশগুলিতে বিপ্লবের প্রেরণা এবং দেশে দেশে মুক্তিকামী জনসাধারণের ভিতর প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ইহাই নম্বেম্বর বিপ্লবকে ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য্যপুর্ণ করিয়াছে।

রুশ শ্রমিক শ্রেণী ভারতের শোষিত জনগণের বৈপ্লবিক অভিনন্দন লও

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মহিমায় এতদিন পর্য্যন্ত জাতিগুলির মধ্যে অনৈক্য, শত্রুতা ও রেষারেষী বাড়াইয়া পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, নভেম্বর বিপ্লব জাতীয়তার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া দেশে দেশে জনগণের সৌহার্দ্দ, ঐক্য ও সমতার বন্ধনে বিশ্বভ্রাতিত্বের বোধে মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে! তাই পরাধীন জাতিগুলি মুক্তি পথের যাত্রায় আজ বিশেষভাবে নভেম্বর বিপ্লবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রতি আস্থাবান হইয়া উঠিয়াছে।

ধণতন্ত্রের স্থৈর্য্য, ভারসাম্য, স্থায়িত্ব প্রভৃতির গালভরা প্রচার করিয়া যেভাবে তাহাকে শ্বাসত বলিয়া ব্যাখা করা হইত নভেম্বর বিপ্লব, তাহা সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শগত বিজয়ের মধ্য হইতে দুনিয়ার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের আদর্শগত দৃঢ়তা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে।

সর্ব প্রথম সোভিয়েট রাশিয়ায় শোষিত শ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর হইতে সামগ্রিক ভাবে ধণতন্ত্রের যুগ কাটিয়া গিয়া তাহার ধ্বংসের যুগ সুরু হইয়াছে। তাহাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টার ক্রটী পুঁজিপতিরা করে নাই; তথাকথিত গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলি একটির পর একটি ষড়যন্ত্র করিয়াছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে চারিদিক হইতে ধ্বংস করিতে; আর তাহাদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টাকে, প্রতিক্রীয়ার প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে শোষিত শ্রেণীর গৌরব লাল ফৌজ।

পুঁজিবাদী দেশগুলির সমস্ত ষড়যন্ত্র, কলা কৌশল প্রতিহত করিয়া নভেম্বর বিপ্লবের দেশ সোভিয়েট রাশিয়া, দুনিয়ার নীপিড়ীত জনগণের আশা আকাঙ্খার নির্ভর যোগ্য দুর্গরূপে, বিশ্বব্যপী মুক্তিযোদ্ধাদের, সতর্ক প্রহরায় প্রতিনিয়ত সফল বিপ্লব রচনায় সহায়ক ও বিশ্বস্ত কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুনিয়ার মজুর, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী-উপশ্রেণীর আপামর জনসাধারণ, নভেম্বর বিপ্লবের দিনটিকে তাই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। নভেম্বর বিপ্লবের এই ঐতিহাসিক দিবসে, দেশে দেশে মুক্তিকামী জনসাধারণ, নূতন সামাজিক শ্রেণী সম্বন্ধের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির বৈজ্ঞাণিক বিশ্লেষণের উপর সংগ্রামের কৌশল নির্ণয় করিয়া দৃঢ় পদে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নূতন করিরা শপথ গ্রহণ করে। এই দিনটিতে নূতন করিয়া রাশিয়ার সর্বহারা শ্রমিককে দুনিয়ার মেহন্নতি জনতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতেব শোষিত জনসাধারণ বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানায়।

ধ্বংসস্তুপের ভিতর হইতে নূতন শক্তির অভ্যুত্থান

প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের মরণ যজ্ঞে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বাজার দখলের লড়াইয়ের মাঝখানে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী সোভিয়েট ইউনিয়নে যে নূতন সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কয়িয়াছে—নভেম্বর বিপ্লব পুঁজিবাদী দুনিয়ার যে ফাটল ধরাইয়াছে—যুদ্ধোত্তর ধুগে ধনতন্ত্রের পক্ষে তাহা কাটাইয়া ওঠা তো দূরের কথা উপরন্তু সেই ফাটল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করিবার বিশ্ব ব্যাপী পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তির জয়ের মাশুল যোগাইতে যে জার্ম্মানীকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল—সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার মানসে, ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত পুনরায় ফ্যাসীবাদী কায়দায় সেই জার্ম্মানীকে সঞ্জিবীত করিয়া তুলিল। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত সংকট কাটাইয়া তাহার ধ্বংসের যুগকে পিছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আর একটা যুদ্ধ বাঁধাইবার সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য আবেসিনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশকে ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের কাছে বলি দেওয়া হইল। ফ্যাসিষ্ট দানবের শক্তিকে অপরাজেয় করিয়া তুলিতে পুঁজিপতি দেশগুলি সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধর ও মার্কিন অর্থলিপ্সুদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরুতেই ফ্যাসিষ্ট ঝটিকা বাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধুলিস্মাৎ করিয়া দিবে—ইহা দিবা স্বপ্নই রহিয়া গেল। সারা ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের পর সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করিতে গিয়া জার্মান ফ্যাসিষ্টরা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এদিকে বর্ব্বর ফ্যাসিষ্ট অত্যাচার ও শাসনের বিরুদ্ধে এক বিরাট ফ্যাসীবিরোধী গণসংগ্রাম দানা বাঁধিয়া উঠিল।

লাল ফৌজের অগ্রগতি ও ফ্যাসী বিরোধী গণসংগ্রাম ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে পর্য্যুদস্ত ও পরাস্ত করিয়া দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের মধ্য দিয়া বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানীয়া, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল। যুদ্ধোত্তর কালে চীনের জনগণ মুক্তি সংগ্রামের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া, নয়া চীনে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল। উত্তোরত্তর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিল নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। জনগণের বিজয়ের জয়যাত্রা ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে কাঁপন ধরাইল। অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত বেড়াজালে নব জাগ্রত নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে আবদ্ধ ও অবলুপ্ত করার বিরামহীন কার্য্যকলাপ চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিল। নয়া গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী ও ভ্রাত্রিত্বের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমস্ত অবরোধ ও অপচেষ্টা অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিল। নূতন পরিবেশে নব জাগ্রত দেশের জনগণ সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির নিশ্চয়তায় দেশের উন্নয়নে আত্ম নিয়োগ করিল—সাম্রাজ্যবাদের কায়েমী স্বার্থের যবনিকা টানিয়া দিল। এতদিন পর্য্যন্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে দুনিয়ার বাজারে যে একাধিপত্য ও অখণ্ডতা লইয়া চলিতেছিল—তাহা দ্বিধাবিভক্ত হইল। বাজারের এই সংকোচন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া ধনতন্ত্রের ধ্বংসের দিনকে আরও নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিল।

ধণতন্ত্রের সেরা ঘাঁটি মার্কিণী সংকটই পুঁজিবাদের শোচনীয় অবস্থার সাক্ষ্য

আজ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সংকট চরমে উঠিয়াছে। ধনতন্ত্রী শিবিরের নেতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান তবুও আজ তাহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে—বিরাট সংকট তাহার অর্থনীতিকে বিপর্য্যস্ত করিতে বসিয়াছে। মার্কিণ সরকারের নিজস্ব স্বীকৃতি হইতেই জানিতে পারা যায় সেখানে বেকার সমস্যা কি রকম তীব্রভাবে প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকায় প্রচণ্ড গতিতে কারুশিল্প, বিশেষ করিয়া যুদ্ধ শিল্পে আগাইয়া গিয়াছিল। তথাপি যুদ্ধ থামিতে না থামিতেই, ১৯৪৪ সাল হইতেই শিল্পের অবনতি আরম্ভ হইল। ১৯৪৬ সালে ১৯৪৩ সালের তুলনায় শিল্পোৎপাদন শতকরা ৩৩½ ভাগ কমিয়া গেল। ১৯৪৬

সালের শেষার্দ্ধে আবার দ্রুত অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করিল। সর্বপ্রথম নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদন কমিতে লাগিল। '৪৯ সালের প্রথম তিন মাসে বস্ত্রশিল্প কমিল শতকরা ২৫ ভাগ। পাদুকা শিল্প কমিল শতকরা ২৭ ভাগ। তাহা ছাড়া রবার, কাঁচ, কাগজ, সাবান ইত্যাদি লঘু শিল্পজাত দ্রব্যে উৎপাদও ক্রমশ কমিয়া যাইতে লাগিল। ইস্পাতের উৎপাদন কমিল শতকরা ৭৮ ভাগ এবং পর পর কমিয়াই চলিল। যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রেও শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ কাজে নামিয়া আসিল। খনি-শিল্পেও সংকট দেখা দিতে লাগিল। প্রচুর কয়লা জমিয়া আছে কিন্তু 'বাজারের অভাব'। তামার দাম কম ও চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় বহু তামার খনিতে কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মার্কিণ শিল্পের অধিকাংশ শাখাতেই 'অত্যুৎপাদন' সংকট দেখা দিয়াছে

সরকারী কৃষি দপ্তরের '৪৮ সালের ঘোষণায়—'আবাদী জমি শতকরা ৮ ভাগ কমানোয়' পরিস্কারভাবে কৃষি জগতের সংকটও ফুটিয়া উঠিয়াছে। '৫০ সালে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন গম উৎপাদন, তুলা, তামাক চীনাবাঁদাম ইত্যাদির চাষও ক্রমশঃ কমাইয়া আনা হইতেছে। গৃহনির্মাণ কার্যে ও মন্দাগতি দেখা যাইতেছে। একমাত্র '৪৮ হইতে '৪৯ সালেই গৃহনির্মাণের জন্য ১২½ কোটী ডলার কম ব্যয় করা হয় অথচ সেনেট কমিশন পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে ৬০ লক্ষেরও বেশী গৃহ বাসের অযোগ্য বলিয়া সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

বর্ত্তমান পুজিবাদী. দুণিয়ার মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের আভন্তরীণ সংকটের যে রূপ উপরে বর্ণিত হইল তাহাই সমগ্র পুঁজিপতি দেশগুলির আভ্যন্তরিন সংকটের পূর্ণ পরিচয় দিবে।

মার্কিণ যুদ্ধোদমে পুঁজিবাদী দুনিয়া যুদ্ধ-চক্রে পর্য্যবসিত

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ নিজের অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ের বোঝা অণ্যের ঘাড়ে চাপাইবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। ধনিক রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া মার্শাল প্ল্যান চালু করিয়া ধণতান্ত্রিক দেশগুলিকে সাহায্যের নামে নিজের পক্ষপুটে ধারণ করিবার ফাঁদ পাতিয়াছে। একদিকে যুদ্ধোত্তর ফলে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই অর্থ নৈতিক আভ্যন্তরীণ সংকটের চাপে, অন্য দিকে গণ আন্দোলনের আশঙ্কায় মার্কিণী দাসত্বের ফাঁদে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পা দিতে বাধ্য হইয়াছে।

সাম্যবাদের জয় যাত্রায় ধানক রাষ্ট্রগুলিকে আতঙ্কগ্রস্থ করিয়া তুলিয়া মার্কিণী প্রচেষ্টা সমগ্র জাতিসংঘের সনদ লঙ্ঘণ করিয়া ধণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমরোপকরণ জোগাইয়া অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও যুদ্ধঘাঁটি নির্মান করিয়া চলিয়াছে মার্কিণ সমর নায়কেরা। বৃটেন ও ফ্রান্সের মত উন্নত ধণতান্ত্রিক দেশও আজ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত হইয়াছে—এমন কি বহুক্ষেত্রে ইহাদের সার্বভৌমত্ব ও মার্কিণ তাঁবেদারীতে ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে।

পশ্চিম জার্মানীর সাথে 'বন' চুক্তির মারফৎ নূতন, করিয়া জার্মানীকে পুনরস্ত্রীকরণ করা হইতেছে। কুখ্যাত ফ্যাসিষ্ট সমর নায়কেদের অবাধে ফ্যাসিষ্ট সংঘ গড়িতে দিয়া এবং সমগ্র পশ্চিম জার্মাণীতে পুরাতন ফ্যাসিষ্ট দুস্কৃতকারীদের সমাবেশ ঘটাইয়া তাঁহাদিগকে মার্কিণী অস্ত্রশস্ত্রে পুরাদমে সজ্জিত করা হইতেছে।

বৃটেন ও আমেরিকা জাতি সংঘের সনদ লঙ্ঘন করিয়া জাপানের সহিত পৃথক চুক্তি করিয়া সমরতন্ত্রী জাপানকে পুনরস্ত্রীকরণ ও জাপানে যুদ্ধঘাঁটি নির্মান পর্ব মার্কিণ তদারকে প্রকাশ্যেই চালাইয়া যাইতেছে।

এক কথায় পুঁজিবাদী দুনিয়া মার্কিণ যুদ্ধবাজদের নেতৃত্বে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সংকট হইতে ত্রাণের আশায় আর একবারের জন্য যুদ্ধায়োজনে মাতিয়া উঠিয়াছে। এটমের হুমকি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বীজাণুযুদ্ধের প্রয়োগ করিয়া এক ভয়াবহ যুদ্ধের আশংকায় পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের মনে বিভীষিকা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রে ক্ষুদে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অংশ

চীনের গণ-অভ্যুত্থানের পর হইতে এশিয়ার অনুন্নত অনগ্রসর দেশগুলিতে তথা ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশের ছোট ছোট ধনবাদী হিস্যাদারদের যুদ্ধ জোটে টানিয়া লওয়ার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দেশগুলিতে তাঁবেদার রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করা হইতেছে। মূল চীন ভূখণ্ড হইতে জনগন দ্বারা বিতাড়িত কুখ্যাত চিয়াং কাইসেককে মার্কিন তদারকে ফরমোজার অধিশ্বর করা হইয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় সিংম্যানরীকে শিখণ্ডী রাখিয়া কোরীয় জনগণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী মার্কিণ অভিযান; ভিয়েৎনাম, মালয়, ইন্দোচীন, বর্মা প্রভৃতি দেশে সাম্রজ্যবাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই পারিচায়ক। ভারত ও পাকিস্তানও সেই চক্রান্ত হইতে বাদ যায় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কমনওয়েলথ অব নেশন্স-এর দাসত্বে শৃঙ্খল সেই কথারই সাক্ষ্য দেয়।

মার্কিন দস্যুদের কোরীয় জনগণের উপর বিভৎস হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের মেডিক্যাল মিশন পাঠানো মার্কিন প্রভুদের তুষ্ট করারই পরিচায়ক। ভারতের বুকে, মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য, গুর্খা সৈন্য সংগ্রহের অবাধ অধিকার দান কমনওয়েলথ অব নেশনস্ এর 'মর্য্যাদার' সম্পর্কের সত্যিকারের রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

ভারত তথা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ সমূহের 'উন্নতি' কল্পে মার্কিন সাহায্যের বহর দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অবস্থায় চরম দুর্গতির দিনে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে যে সমস্ত রাজনৈতিক সর্ত্যবলী আরোপ করা হইয়াছে অধিকন্তু 'কমিউনিটি প্রযেক্টের' মধ্য দিয়া মার্কিন আধিপত্য সরাসরি বিস্তার প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যের নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিকে গ্রাস বা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়া চলিয়াছে।

এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনবাদী রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার গোষ্টিতে পরিণত হইয়াছে—সাম্রাজ্যবাদ আশ্রিত এই শাসক গুষ্টি নিজ নিজ দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষক ও গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সসস্ত্র প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে—নিজেদের অস্তিত্ব সংকটে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটি নির্মাণের পূর্ণ সুযোগ এবং নিজ নিজ দেশের যানবাহন, পোতাশ্রয়, বন্দর প্রভৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের সৈন্য চলাচলের অবাধ সুযোগ সুবিধা দিয়া ছোট হিস্যাদার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া চলিয়াছে।

★ বিশ্বযুদ্ধের জটিলতা ★

একদিকে চলিয়াছে যুদ্ধবাদীদের জোট পাকাইবার ষড়যন্ত্র অন্যদিকে তাহাদের আভ্যন্তরীণ সংকট ও বিরোধ ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। ইরাণ ও ইরাকের তৈল খণি লইয়া বৃটেন ও আমেরিকার বিরোধ এক অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কোরিয়ায় মার্কিণী সমরনীতির ব্যর্থতায় বৃটিশ কুটনৈতিক চাপ আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। কাশ্মীরের সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছে। উপরন্তু অর্থ নৈতিক সংকটের চাপ ক্রমশঃ পুঁজিবাদী দুনিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করিতে বসিয়াছে—এই চারিদিক হইতে ইহারা আওয়াজ তুলিয়াছে যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই।

ধনতন্ত্রের সংকট ত্রাণের যুদ্ধই একমাত্র অবলম্বন—তাই যুদ্ধের পাকে জড়াইয়া পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলি সচেষ্ট হইয়াছে—একদিকে নিজেদের সংকটের চাপ কমাইতে অন্যদিকে যুদ্ধের মধ্য দিয়া দলবদ্ধভাবে দেশে দেশে সাম্যবাদের অগ্রগতিকে রোধ করিতে তথা সোভিয়েট ও নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করিতে।

ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্র নিজ নিজ দেশে আজ অর্থ নৈতিক সংকট, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি ধনবাদী শোষণে অতিষ্ঠ জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে যে একটানা সংকট ধনতন্ত্রকে পাইয়া বসিয়াছে—তাহার হাত হইতে ত্রাণ পাওয়ার আশায় প্রতিবারের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হওয়া সত্বেও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ বাধাইবেই; কেননা বাঁচার অন্য কোন উপায় আজ আর তাহাদের নাই, তাই যতদিন সংকট কুটনৈতিক বেড়াজালে আটকাইয়া রাখা যায়—তার চেষ্টা করিয়া পরিণামে যুদ্ধের মধ্য দিয়া আবার কিছুদিন নিজের ধ্বংসের দিনটিকে পিছাইয়া দেওয়ার অভিসন্ধি লইয়াই আর একটি যুদ্ধের আয়োজনে পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলি মাতিয়া উঠিয়াছে।

এবারের যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লইয়া ইতিমধ্যেই গবেষণা সুরু হইয়া গিয়াছে। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে প্রথমেই ছোটখাট সংঘাত (এমনকি সশস্ত্র সংঘর্ষও) যা বর্তমানেই ঘটিতেছে তাহা হইতে একথা বলা চলেনা যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সরজমিনে আসিয়া গিয়াছে। কেননা বিশ্বযুদ্ধ বলিতে যেমন প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধে যোগদান তথা এই যুদ্ধের ব্যপ্তি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বুঝায়—সেই রকম অবস্থা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের শত চেষ্টা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে তাহাতে সমগোত্রীয় ও সমপর্য্যায়ের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বাগে পাইলে তাহাকে টেক্কা দেওয়ার সুযোগ হারাইবে এমন নয়—তাই সংকটের বিশেষ পর্য্যায়ে বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি আর এক ধাপ ঘোরাল হইলে ধনবাদী যুদ্ধবাদী শিবিরে নিজেদের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন; পুঁজিবাদী শিবিরের যে বিরোধ ও সংঘর্ষ মূলত নিজেদের অর্থ নৈতিক সংকট ও আভ্যন্তরিণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল হিসাবে দেখা দিয়াছে সেই বিরোধের সদব্যবহার করার মধ্য দিয়া পুঁজিবাদের উৎখাত করার চেষ্টা মুক্তিকামী জনসাধারণকে করিতে হইবে—উৎসাহের প্রাবল্যে পুঁজিবাদী শিবিরের এই আভ্যান্তরীণ বিরোধকে অতিরঞ্জিত করিয়া বা অত্যাধিক প্রাধান্য দিয়া দেখিবার ঝোঁকে যাহারা পুঁজিবাদী শিবিরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ বা এই শিবিরের শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করে তাহাদের ধারণার সঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নাই। ধনতান্ত্রিক শিবিরের আভ্যান্তরীণ সংকট ও সংঘর্ষ যত তীব্র হইতেছে—সেই তীব্রতা লাঘবের জন্য সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া নিজেদের জোট উত্তরোত্তর পাকাপাকি করিবার ষড়যন্ত্রও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে—তাই সমাজতন্ত্রী শিবিরের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টাও এক লক্ষণীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ বাঁধাইবার মূলে যেমন পুঁজিবাদের

আভ্যন্তরীণ সংকট রহিয়াছে তেমনই যুদ্ধের মারফৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পৃথিবী হইতে মুছিয়া দেওয়া যায় কিনা এ প্রচেষ্টাও সমান গুরুত্ব লইয়াই রহিয়াছে। তাই যুদ্ধের মধ্য দিয়া পুঁজিবাদীরা প্রথমটির (পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীন সংকট) দূর করার চেষ্টার সাথে সাথে দ্বিতীয়টী (সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসের চেষ্টা) হইতে বিরত থাকিবে এ কথা ভাবার কোন কারণই নাই—আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে পুঁজিবাদী ও যুদ্ধবাদীরা সমাজতন্ত্রী শিবিরকে আক্রমণ করিবে না—এ কথা চিন্তা করা, শিকারী বাঘের উন্মুক্ত থাবার সম্মুখে বসিয়া চোখ বুজিয়া বিপদ এড়াইবারই সামিল।

যুদ্ধবাজদের চক্রান্তকে শান্তির ★ সংগ্রাম ব্যর্থ করুক ★

শান্তিকামী মানুষ আজ আর নির্বাক বা নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় অবতরন করিবে না—বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আহ্বানে ব্যপকতম শান্তি সংগ্রামের অভিযান এই কথাই প্রমাণ করে। শান্তি জয় করিয়া লইবার দৃঢ় সংকল্প দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শান্তি আন্দোলনের বর্ত্তমান পর্য্যায়ে একদিকে যেমন বিরাট সম্ভাবনা বিপুল আশার সঞ্চার করিয়াছে; অন্য দিকে কোন কোন দেশে শান্তি আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ গলদ—শান্তি আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যপকতম ভিত্তি রচনার পরিবর্ত্তে, দলমত নির্বিশেষে মেহনতী জনগণের বৃহত্তম সমাবেশের পরিবর্ত্তে, বাছাই করা গুটি কয়েক ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া—শান্তি আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা অপসারণের জন্য শান্তিকামী জনশক্তির দৈনন্দিন নাগরিক ও গণতান্ত্রিক, অন্যান্য আন্দোলনের সাথে শান্তি আন্দোলনকে যুক্ত করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। শান্তি আন্দোলনের শক্তি সমাবেশের এই ত্রুটি ছাড়াও মতবাদিক যে সমস্ত বিভ্রান্তি এখনও কোন কোন দেশের শান্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; কমরেড ষ্ট্যালিন বিশেষভাবে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই সম্প্রতি এক প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, "যুদ্ধের অনিবার্য্যতাকে চিরতরে দূর করিতে হইলে সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিতেই হইবে।" বিশ্বশান্তি আন্দোলনের ধারায় দেশে দেশে শান্তির শক্তি বৃদ্ধি—এখনও যে সমস্ত জায়গায় ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়াছে তাহা দূর করিয়া শক্তিশালি শান্তি আন্দোলন প্রচুর সম্ভাবনার সাক্ষ্যই দেয়—আরও সাক্ষ্য দেয় দেশে দেশে শান্তিকামী জনগণের শান্তি রক্ষার দুর্জয় মনোভাবের এবং অটল প্রতিজ্ঞার।

★ জাতীয় পরিস্থিতি ★

১৯৪৭ সালে ভারতের রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কাছ হইতে আপোষে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লওয়ার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা আবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। বলাবাহুল্য যে, উপরোল্লিখিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্লেষণ করিয়া ভারতের জাতীয় পরিস্থিতি ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সমাজ বিপ্লবের স্তর নির্ণয় করিতে হইবে।

দেশী ও বিদেশী পুঁজির ★ গাটছড়া ★

ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষের ভাগবাটোয়ারা করিয়া লওয়ায় ভারতের অখণ্ডতা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। একদিকে জাতীয় কংগ্রেস ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে, অন্যদিকে মুসলীম লীগ সামন্ততন্ত্রী ও পশ্চাদ পদ ধনিক গোষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে পাকিস্থান রাষ্ট্র পরিচালনায়।

গতযুদ্ধের সময় ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী বেশ একটু সুবিধা করিয়া লয়। ১৯৩৫ সালে একচেটিয়া বিনিয়োগের শতকরা ৭ ভাগ ছিল ভারতীয়। '৪৬—'৪৭ সালেই এই হার পালটাইয়া যায়। এই সময় এক চেটিয়া নিয়োগের মোট অংশ শতকরা ২৭ ভাগ দাঁড়ায় ভারতীয় এক চেটিয়া পুঁজিপতিদের। '৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর এই অবস্থার আরও পরিবর্ত্তন ঘটে। বহু বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী ভারতীয় ক্রোরপতিরা কিনিয়া লয় এবং আরও বহুগুলিতে মোটা অংশ নিয়োগ করিয়া তাহারা খাঁটি বিদেশী এজেন্সীগুলিকে স্বদেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জনের পরেও, যেমন দেশী ছাপের আড়ালে ভারতীয় জনতাকে শোষণ করিতেছে দেশীয় পুজিপতিদের সহযোগীতায়, তেমনি দেশীয় ধনিক শ্রেণী একচেটিয়া বিদেশী পুজিপতিদের সহযোগীতায় দেশের ও বাইরের বাজার দখল করিয়াছে। দেশী বিদেশী পুজিপতিদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও যেমন রহিয়াছে তেমনি এক গভীর আতাতও গড়িয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ বিদেশী শাসনের আমলে দেশী বিদেশী পুজিপতিদের ভারতীয় বাজার শোষণের ক্ষেত্রে যে সম্পর্ক ছিল তাহা আজ পরিবর্ত্তিত হইয়া—এতদিনের ছোট হিস্যাদার ভারতীয় পুজিপতি শ্রেণী অর্থ নৈতিক শোষণের ব্যাপারে বড় হিস্যাদারে রূপান্তরীত হইয়াছে —আর তার প্রতিদানে ভারতের পুজিপতি শ্রেণী দেশীয় বাজারে বিদেশী কায়েমী স্বার্থের প্রহরায় নিযুক্ত করিয়াছে নবলব্ধ রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা।

ভারতের সমাজ জীবনে ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য ★ বিস্তার ★

ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে ধণতন্ত্রের অনুপ্রবেশটা আজ বেশ ভাল ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষনের আওতায় দেশীয় ধণতন্ত্রের বিকাশ যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে—কৃষির উপর তার প্রভাবও অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়াছে। ধণতন্ত্রের জোয়ার ভাটার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের বাজারেও তেজী ও মন্দার ভাব দেখা যায়। ভারতের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধানের দামের দৃষ্টান্ত এই কথার যুক্তিবত্তা প্রমাণ করিবে এবং ভারতের কৃষির উপর ধণতন্ত্রের প্রভাবের সাক্ষ্য দিবে। ভারতবর্ষে ধণতন্ত্রের প্রভাব যত বাড়িয়াছে ধানের দামও তত বাড়িয়াছে। আবার '২৯—'৩৯ সাল পর্য্যন্ত যখন বিশ্বব্যপী ধণতান্ত্রিক মন্দা দেখা দিয়াছে তখন দাম পড়িয়াছে। গত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আবার দাম বাড়িতে সুরু করিয়াছে। এই ভাবে ধণতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবে ভারতীয় কৃষিও প্রভাবিত হইয়াছে। ধণতন্ত্র চায় কৃষিকে ধণতান্ত্রিক কায়দায় পরিচালিত করিতে—ইহার প্রধান বাহন হইল মহাজনী মূলধন। ভারতের মাটিতে এই মহাজনী মূলধনকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে ধণতন্ত্র। কৃষকদের দেনার দায়ে একের পর এক জমি হইতে উৎখাত করিয়া দিন মজুরে পরিণত করিয়াছে। এই দিনমজুর বা ক্ষেত মজুরের সংখ্যাই হইল কৃষিতে ধণতন্ত্রের অনুপ্রবেশ মাপিবার মাপকাঠি। যতই ধণতন্ত্রের কায়দায় চাষবাস চলিবে ক্ষেতমজুরের সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ধণতন্ত্রের তেজী মন্দার সঙ্গে তাল রাখিয়া ক্ষেতমজুরের সংখ্যার বাড়তি কমতি হয়। ভারতীয় কৃষিতে সমান্ত প্রথার মধ্যে ধণতন্ত্রের অনুপ্রবেশ বেশ ভাল ভাবেই হইয়াছে। ভারতবর্ষের কৃষিতে ধণতন্ত্রের প্রবেশের পর কৃষক শ্রেণীকে সাধারণতঃ (১) ভূমিহীন (২) গরীব (৩) মধ্যবিত্ত এবং (৪) ধনীকৃষক এই চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। গোটা ভারতবর্ষে ভূমিহীন গরীব চাষীর সংখ্যা শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগের মত, ১০ হইতে ১৫ ভাগ মধ্যবিত্ত চাষী, বাকী ধনী চাষী। ভারতের আয়তন ও জন সংখ্যার দিক হইতে কৃষক সম্প্রদায়ই বেশীর ভাগ ক্ষেত্র জুড়িয়া রহিয়াছে—আর সেই কৃষক সম্প্রদায়ের ভিতরও ধণতন্ত্রের প্রবেশ ও প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতির চরিত্র বিশ্লেষণে ধণতন্ত্রের আধিপত্যের সাক্ষ্যই দেয়।

দেশীয় পুঁজিপতিদের অসহায় ভাবে বিদেশী পুঁজিপতিদের ★ পায়ে আত্মসমর্পন ★

ধ্বংসমুখ ধণতন্ত্রের যুগে পুঁজিপতি দুনিয়ার একচেটিয়া পুঁজির প্রভাব এমন একস্তরে আসিয়াছে—সেখানে অনগ্রসর ধণতান্ত্রিক দেশগুলি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন না কোন উন্নত ধণতান্ত্রিক দেশের সহিত গাটছড়া না বাঁধিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পর্কেই নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। যদিও এই আত্মসমর্পনের ফলে নিজের দেশের শিল্পোন্নতি ভীষণভাবে বাধাগ্রস্থ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত আভ্যন্তরীণ সংকটের হাত হইতেও রক্ষা পায় না তথাপি অনেকটা অসহায়ভাবে পশ্চাদপদ দেশগুলি বিশ্ব ধণতন্ত্রের জোয়ালে এমন ভাবেই নিজেদের বাঁধিয়া রাখে। নিজের দেশে শিল্পোন্নতির গুরু দায়িত্ব ভার আজ আর ইহারা বহিতে পারে না। তাই বিদেশী উৎপন্ন দ্রব্য কিনিয়া ভারতীয় কারখানায় বিভিন্ন অংশ জুড়িয়া দেশী ছাপ মারিয়া সহজে পুঁজি বাড়াইবার বেনিয়া বৃত্তির পথেই ইহারা অগ্রসর হইয়াছে। মূল ও বৃহৎ শিল্প গড়ার ঝক্কি এড়াইয়া সোজাসুজি উন্নত ধণতান্ত্রিক পুঁজিবাদীদের স্বরনাপন্ন হইয়াছে। উন্নত ও একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও ইহাদের গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়া আগাইয়া আসিয়াছে। দেশে দেশে সাম্যবাদের জয় যাত্রা তথা জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান রোধ করার জন্য উন্নত পুঁজিপতি দেশগুলি দেশীয় অনগ্রসর পুজিপতিদের রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় আসীন করিয়া অর্থ-নৈতিক দাসত্বের বেড়াজালে ঘাটি আগলাইবার কাজে নিয়োগ করিয়াছে।

ভারতীয় ধনিক রাষ্ট্রের কবর ★ কেন রচনা করিব ★

ভারতের ধনিক শ্রেণী আপোষের ক্ষমতা লাভের পর জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর শেষ হইয়া গিয়াছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও শক্তি সমাবেশে এক বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ আর প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন বা পরিচালক নয় তাহার পরিবর্ত্তে দেশীয় পুজিপতি শ্রেণী ভারতীয় রাষ্ট্রের রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী স্বার্থের যে কোন ঘাটিকে আক্রমণ করিতে গেলে আজ সরাসরি দেশীয় ধনিক রাষ্ট্রের সমস্ত বাহিনীর মুকবিলাই করিতে হইবে সর্বপ্রথম, নয়তো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ফাঁকা কথায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। দেশীয় ধণিক রাষ্ট্রে সসস্ত্র বাহিনীর মুকাবিলার মধ্য দিয়া ভারতের বর্ত্তমান পুজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ তথা ধনিকতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী স্বার্থ ও ঘুণেধরা সামন্ততান্ত্রিক গলিত ব্যবস্থার উৎখাতের সংগ্রাম;—সমাজ বিপ্লবের কোন স্তরের নির্দ্দেশ দেয়? বলা বাহুল্য সমাজ বিপ্লবের স্তর হিসাবে ইহাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব মধ্যপথে শেষ হওয়ার ফলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূর্ণিত সংস্কার বা দাবীগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

★ মার্ক্সবাদী বিচারের কষ্টিপাথরে ব

দল বিচারের মুলপ্রশ্ন

কোন একটি রাজনৈতিক দলকে বিচার অথবা সেই দল সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে বিষয়টীকে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হবে। সুতরাং কোন রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারা, কার্য্যাবলী, ও গতিপ্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে লেনিনবাদীরা প্রথমেই সামাজিক শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং তার উপরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই আজ বহু মার্ক্সবাদী কর্ম্মীর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কমিউনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটী আসলে শ্রমিক শ্রেণীর সাম্যবাদী দল কিনা, এই দলকে সংশোধনের পথে সত্যিকারের কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব কিনা; এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর পেতে হলে এই দলটির শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী বৈশিষ্ট্য, সর্ব্বোপরি ইহার methodology, Strategy ও Tacticsএর বিচার অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি। দলের শ্রেণী চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রয়োজন এই জন্য যে দলই হোক অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষই হোক কেহই শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়, শ্রেণী চরিত্রের ঊর্দ্ধে কেহই বিরাজ করতে পারে না। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীই বিদ্যমান—শোষক এবং শোষিত শ্রেণী। উৎপাদনের উপায়গুলি হচ্ছে শোষক শ্রেণীর হাতে আর যারা বর্ত্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা শুধু নিষ্পেষিতই হয়, শুধু খেটেই মরে, তারাই হচ্ছে শোষিত শ্রেণী। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত, হয় সে শোষক শ্রেণীর স্বার্থের সাথে জড়িত, নতুবা শোষিত শ্রেণীর সমগোত্রীয়। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি অজানিত ভাবেই শোষক অথবা শোষিত এই দুইটি শ্রেণীর কোন না কোন একটির স্বার্থের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে পড়তেই হয়। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে উৎপাদন সম্পর্ক; বাস্তব জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ইহার প্রমান মিলবে। শুধু যে জীবন ধারনের ব্যাপারেই নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব তা নয়, সাহিত্য, আর্ট, বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি মানসিক বিকাশের সর্ব্বস্তরেই প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কোন না কোন শ্রেণীর (অর্থাৎ হয় শোষক অথবা শোষিত শ্রেণী) মনোভাবকেই ব্যক্ত করে চলেছে, কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থকেই পুষ্ট করে চলেছে। রাজনৈতিক দলের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। দল মাত্রেই সচেতন ভাবেই হোক অথবা অজানিত ভাবেই হোক, কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে চলেছে।

মূল প্রশ্নের আলোচনা করতে হলে প্রথমে কতকগুলো মৌলিক বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। মার্ক্সবাদের একটা মূল সিদ্ধান্ত এই যে, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ও অগ্রগতি একটা বিশেষ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে বিশেষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশেই সংগঠিত হয়। এই রাজনৈতিক দলের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ এক শ্রেণীর হাত থেকে তার নিজস্ব ও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী কতৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা, নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের কোন স্তরেই শ্রেণী স্বার্থ বাদ দিয়ে, শ্রেণী-নিরপেক্ষ থেকে, শ্রেণী সংগ্রামের উর্দ্ধে বিরাজ করছে এমন কোন স্বয়ম্ভু রাজনৈতিক দলের কথা চিন্তা করা বাস্তবে অসম্ভব। দলের মধ্য দিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী সংঘবদ্ধ হয়, সংগঠিত হয়, সচেতন হয়, দলের মারফৎ সেই শ্রেণীর স্বার্থ, মনোভাব, আশা-আকাঙ্খা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের রূপ আত্মপ্রকাশ করে। তাই প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই কোন না কোন শ্রেণীর আশা ও আকাঙ্খাকে রূপায়িত করার অস্ত্র স্বরূপ। দলই হচ্ছে শ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও সেরা অংশ। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা একান্তভাবে প্রয়োজন। যদিও প্রত্যেকটী রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হয় কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থ সাধনের জন্যই তথাপি কোন দল কোন শ্রেণীর স্বার্থকে বাস্তবে রক্ষা করে চলেছে—তা বিচার করবার একটা মাপকাঠি থাকা দরকার। এই মাপ কাঠি হচ্ছে ইতিহাসের কষ্টি প্রাথরে মার্কসবাদের বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতীর সহায়তায় দলের Plan, Program ও আদর্শ, সর্ব্বোপরি দলের বাস্তব সমস্যা বিচারের পদ্ধতি অনুধাবন ও তাহার ফলাফল দর্শন। তাই একদিকে ব্যক্তি অথবা কিছু লোকের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আদর্শ-চ্যুতির দরুণ যেমন সমগ্র দলকে বিচার করা চলে না—সেইরূপ শুধু মাত্র আদর্শ নিষ্ঠা, অথবা সৎ ইচ্ছার কথা স্মরণ করে দলকে বিচার করতে গেলে অবশ্যম্ভাবিরূপে ভুল করে বসবো। আমাদের প্রধানতঃ নজর দিতে হবে—কোন পদ্ধতিতে দলের চিন্তাধারা ও সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে—অর্থাৎ দলের methodology ও process of movement এর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারা ও সংগ্রাম পদ্ধতির মধ্যস্থিত দ্বান্দিক সম্বন্ধ যে পথ ধরে ধাপে ধাপে এগোয় তার মধ্য দিয়েই দলের শ্রেণী চরিত্র সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদী বিশ্লেষণে কোন একটি দলের নিছক আদর্শ নিষ্ঠা অথবা সদিচ্ছা আদৌ বড় কথা নয়। কারণ ইতিহাস হতে ভুরি ভূরি প্রমাণ মিলবে যে যথেষ্ঠ সদিচ্ছা থাকা সত্বেও অজানিত ভাবেই একটি শ্রেণীর নামধারী দল আর একটি শ্রেণীর স্বার্থ সাধন করে বসেছে। কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই সমস্ত দলের চিন্তাধারা ও সংগ্রাম পদ্ধতির গলদের জন্যই এইরূপ ঘটেছে। সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে যত সদিচ্ছাই থাক না কেন দল তার ঐতিহাসিক ভুমিকার বাইরে কিছুই করতে পারে না, চিন্তাধারা ও সংগ্রাম পদ্ধতির মাধ্যমে যে শ্রেণীর স্বার্থ ও মনোভাবের সঙ্গে দল মূলতঃ জড়িত থাকে, ইচ্ছা না থাকলেও সেই শ্রেণীর স্বার্থ সাধন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করলে এই শেষোক্ত শ্রেণীর স্বার্থই দলের সত্যিকার শ্রেণীস্বার্থ,

দলের শ্রেণী চরিত্রের পরিচায়ক কী?

যদিও দলের নাম আর একটি দলের স্বার্থ সাধন-কারী বলে প্রচারিত হয়েছে।

দলের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী ভুমিকা

বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বিভিন্ন প্রকার এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধীও বটে, ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতি এবং উহা বাস্তবে সফল করবার সংগঠন পদ্ধতি ও বিভিন্ন ধরনের হতে বাধ্য। এক শ্রেণীর আদর্শ অপরের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত অনেক ক্ষেত্রেই অপরের স্বার্থসিদ্ধির প্রতিকুল, তাই এক শ্রেণীর সংগঠন পদ্ধতিও অপরের পক্ষে অকার্য্যকরী, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যাকর। সেইজন্যই এক শ্রেণীর দলের সাহায্যে অপর শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধি অসম্ভব। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট রূপে নিজস্ব শ্রেণী চরিত্র, শ্রেণী মনোভাব এবং শ্রেণীগত কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট নিয়ে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীরই অস্তিত্ব আছে—বুর্জ্জোয়া ও সর্ব্বহারা শ্রেণী। নির্দ্দিষ্ট এই দুইটি সামাজিক শ্রেণীর মধ্যেই শুধু কোন প্রকার সংশয় ও দোদুল্যমানতা নাই, নিজস্ব রীতিনীতি সংস্কার, কৃষ্টি শ্রেণী বৈশিষ্ট নিয়ে এই দুইটি শ্রেণী ইতিহাসের ধারায় অগ্রসর হয়ে চলেছে নিজ নিজ শ্রেণী স্বার্থ পূরণ করার উদ্দেশ্যে। এই দুইটি শ্রেণী ছাড়াও কয়েকটি মধ্যবর্ত্তী উপশ্রেণীর অস্তিত্ব আমাদের সমাজে বর্তমান। পেটিবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত, কৃষকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণ এই দলভূক্ত। এই উপশ্রেণী-গুলির চরিত্রগত বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, উহারা সংশয়-দোদুল, ঐতিহাসিক ভূমিকায় ইহারা কখনো সর্বহারাশ্রেণীর সাথে হাত মেলায়, কখনো আবার বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর পাশে পাশে পথ অতিক্রম করে। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট এবং নিজস্ব কোন শ্রেণীচরিত্র নাই। বলা বাহুল্য এই উপশ্রেণীগুলিরও নি... রাজনৈতিক দল আছে এবং আমাদের দেশেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যেমন ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা ভারতীয় সর্বহারার স্বার্থসিদ্ধি হতে পারেনা, সেইরূপ পাতিবুর্জোয়াদের ...বাও ভারতীয় শোষিত জনসাধারণের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারেনা। আবার ভারতবর্ষের সর্ব্বহারারা রাজনৈতিক দলও কোন সময়েই ভারতীয় বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়াদের স্বার্থসিদ্ধি তো করবেই না পরন্তু পরিণামে উহাদের উচ্ছেদ সাধন করবে। ইহাই লেনিনবাদের সিদ্ধান্ত। তাই বলে ৮ মনে করা অত্যন্ত ভুল যে, শোষক ও শাসক শ্রেণীর দল কখনো কোন সময়ে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর উপর নেতৃত্ব করতে পারেনা; যেমন বিশেষ কতকগুলো ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ...রণে আজও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তার... শোষিতশ্রেণী ও উপশ্রেণীর উপর তার নেতৃত্ব বহুলাংশে কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছে। যেমন ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী ফরাসী বিপ্লবের সময় অপরাপর ফরাসী শ্রেণীগুলির উপর নেতৃত্ব করেছে, (উনবিংশ শতাব্দিতে সেই সময় অবশ্য বুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিল) যেমন আয়ারল্যাণ্ডের পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী আইরিশ বিপ্লবে আয়ারল্যাণ্ডের শোষিত জনসাধারণকে পরিচালিত করেছে। কিন্তু এইরূপ কোন শ্রেণী বা তাদের দল অপর কোন শ্রেণী তথা সর্বহারা বা কৃষক সাধারণের স্বার্থকে পুষ্ট করেছে এমন কোন নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি কারণে শোষিত শ্রেণী এই সমস্তদলের নেতৃত্বাধীনে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছে, এগিয়ে আসে। যে যে কারণে এই ধরণের ঘটনা বাস্তবে সম্ভব হয় তার মধ্যে প্রধান দু... কারণের একটি হল শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনগত দুর্বলতা। অপরটি এই যে

মউনিষ্ট পার্টি ও তার নব-পর্য্যায় ★

শুধু আদর্শনিষ্ঠা ও সদিচ্ছা ? না দলের চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্ম্মপদ্ধতি ?

শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের সাথে নেতৃত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থ আংশিক ভাবে ও সাময়িক ভাবে সমান্তরালবর্ত্তী থাকে। নেতৃত্বকারী শ্রেণী নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই অপরাপর শ্রেণীর স্বার্থের সাথে নিজের দাবীদাওয়াগুলো ভাসাভাসাভাবে সমান্তরালবর্ত্তী করে রাখে—তাদের সমর্থনে নিজে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবার আশায়। এখানে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। যেহেতু একটি শ্রেণীর বা তার দলের সাহায্যে অপর একটি শ্রেণীর বা সেই দলের কাজ সম্পন্ন হতে পারেনা ঠিক সেই হেতু কোন একটি শ্রেণীর দলকে সংস্কার বা সংশোধনের পথে অন্য শ্রেণীর দলে রূপান্তরিত করা যায় না। মার্ক্সবাদের ইহাই শিক্ষা; আর এই কারণে মার্ক্স যখন দেখলেন যে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল সুবিধাবাদীদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হয়ে কার্য্যতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই আপন ভূমিকা অভিনয়ের উপক্রম করেছে তখন তিনি তা ভেঙ্গে দিয়ে ছিলেন। এবং ইহা বুঝতেন বলেই কমরেড লেনিন যখন দেখলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী মেনশেভিকদের অবিপ্লবী প্রভাবে পড়ে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি কার্য্যতঃ বুর্জোয়াদের দোসর হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তিনি স্বতন্ত্র বলশেভিক দল গঠন করেন, এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার দরুন জীমারোয়াল্ড কনফারেন্সে তিনি ইহা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। এই কথা বুঝতেন বলেই জার্মানীর কার্ল লিবনেক্টও জার্মান সোস্যালডেমোক্রাটিক পার্টি ছেড়ে স্বতন্ত্র স্পার্টাকিষ্ট দল গঠন করেছিলেন।

সুতরাং দলের নাম কোন একটি শ্রেণীর অনুকূলে রাখলেই তা সেই শ্রেণীর দল বলে প্রমাণিত হয় না। দলের প্রকৃত শ্রেণী চরিত্র প্রমাণিত হয় দলের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির ফলাফল ঐতিহাসিক কষ্টিপাথরে যাচাই হবার পর। যেহেতু প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তার নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে বাধ্য সেই হেতু কোন একটি শ্রেণীর দলকে সংশোধনের পথে আর একটি শ্রেণীর দলে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে এখানে একটি কথা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা দরকার; তা হচ্ছে এই যে এক শ্রেণীর দল সংশোধনের পথে অন্য একটি শ্রেণীর দলে রূপান্তরিত হয় না বটে কিন্তু একটি শ্রেণীর নাম ভাঙ্গিয়ে আর একটি শ্রেণীর স্বার্থকে পরিপুষ্ট করা চলে। শোষিত শ্রেণীর দল হিসেবে পরিচয় দিয়েও প্রকৃত চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির অভাবে যে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ পরিপুষ্ট করা হয় তার প্রমাণ অতীতের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলো এবং বর্ত্তমানে যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি।

কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধারা

দল বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় ও মাপকাঠিতে কোন একটি দলের শ্রেণী চরিত্র ও সেই দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা সম্ভব। এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করে দেখা যাক্ ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটী (যোশী, রণদিভে, রাজেশ্বর ও অজয় ঘোষ মার্কা) আদৌ সাম্যবাদী বা শ্রমিক শ্রেণীর দল কিনা। এবং আমরা যখন বলি ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীর সত্যকারের সাম্যবাদী দল গঠন কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান নেতৃত্ব ও Party structure এর ধংস সাধনের পথেই সম্ভব—তা মার্কসবাদ সম্মত কিনা। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে—কম্যুনিষ্ট-পার্টি যখন রণদিভের নেতৃত্বের নানা ধরণের বিভ্রান্তি সম্বন্ধে Inner Party struggle এর নাম করে যথাযথ সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পথ এড়িয়ে গিয়ে—শুধুমাত্র কর্ম্মিদের দলের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল তখন আমরা কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিদের কাছে এই প্রশ্নটি তুলেছিলাম এবং দাবি জানিয়েছিলাম যে দলের মধ্যে ও দলের বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে আলোচনার জন্য উপরোক্ত প্রশ্নটিকে তুলে ধরা দরকার। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব খুব সুকৌশলে এই প্রশ্নটী এড়িয়ে গিয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নজির দেখিয়ে নিজেদের নিরবচ্ছিন্ন ভুলভ্রান্তির আসল কারণ যে শ্রমিক শ্রেণীর দল হিসেবে আদৌ গড়ে উঠতে না পারা ও দলের পাতিবুর্জোয়া শ্রেণী চরিত্র, এই সত্যকে চাপা দিয়ে দলের কর্ম্মিদের চুড়ান্ত ভাবে বিভ্রান্ত করেছে। যাই হোক, এই প্রশ্নটীর সমাধান না করে দলের কোন্ কার্য্যকলাপের মধ্যে কৌশলগত কি কি ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে—এই অর্থহীন আলোচনায় সাধারণ কর্ম্মিদের ব্যস্ত রাখার যত চেষ্টাই নেতারা করুন না কেন আমরা আশা রাখি দলের ভেতরে সত্যিকারের কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিদের মনে এই প্রশ্ন অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিতে বাধ্য। কারণ, সত্যিকারের কম্যুনিষ্ট মাত্রেই যারা মার্কসবাদ লেনিনবাদের সারমর্ম্ম অনুধাবন করতে পেরেছেন জানেন যে—নিছক দলীয় স্বার্থরক্ষা ও দলকে চিরতরে টিকিয়ে রাখার জন্য দল গড়ার প্রয়োজন নয়। দল গড়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও আদর্শের ধারা বাহক হিসেবে—মানব সমাজকে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজের শ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও এমনকি তার নিজস্ব রাজনৈতিক দলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে এক শ্রেণীহীন শোষণহীন বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই সত্যিকারের কম্যুনিষ্ট মাত্রকেই গোঁড়ামি ও অন্ধতা-জনিত যে আত্মপ্রত্যয় তার নাগ পাশ হতে মুক্ত হয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজেদের কার্য্যকলাপের বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম্মিদের মধ্যে যারা কম্যুনিষ্ট গুণাবলীর অধিকারী তাদের বড় দলের মোহ ও সুবিধা ত্যাগ করতে হবে। এর জন্য শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিপ্লবী আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতা ও যথেষ্ট সৎসাহসের দরকার। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটি কম্যুনিষ্ট তো নয়-ই, উপরন্তু পাতিবুর্জ্জুয়াদের ব্যক্তিবাদের (individualism) উপর এর মূল ভিত্তি রচিত। এই দলের শুরু থেকে তার ২৪ বৎসরে সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় মতবাদিক ও সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই এদের চিন্তা ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি মার্কসবাদের মূলনীতি বিরোধী এবং ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

Strategy ও Tactics.

কোন একটা পার্টি সাম্যবাদী নামে বেশ কিছু দিন যাবৎ কাজ করার অধিকার পেয়ে আসছে বলেই অথবা সাংগঠনিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে বলেই যদি সেই পার্টি সাম্যবাদী নামের যোগ্য হয়—তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু ইতিহাসে আমরা আগেও দেখেছি এবং এই সেই দিন ও যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্টপার্টিকে এমনকি নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম পর্য্যায়ে সাফল্য অর্জন করার পরও সাম্যবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু Fascist Partyতে পরিণত হতে দেখেছি। তাই আমরা বলি মানুষের সদিচ্ছা—বিশ্বস্ততা ও সরলতারও একটা মাত্রাবোধ থাকা দরকার। এই মাত্রাবোধ হচ্ছে—দলগঠনের আসল উদ্দেশ্য কি, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও আদর্শ কি, আজপর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কি, ও মার্কসবাদের মূল নীতি সম্বন্ধে, সঠিক ধারণা থাকা এবং দলের প্রতি আনুগত্যের সাথে সাথে দলের প্রতিটি চিন্তাধারা, কোন একটা সমস্যাকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি, দলের Strategy ও tacticsকে উপরোক্ত মাপ কাঠিতে প্রতিনিয়ত বিচার করে দেখা—প্রথমতঃ, দল তার মূল সংগ্রাম নীতি (Strategy) গ্রহণের ব্যাপারে নির্ভুল কি না। দ্বিতীয়তঃ, দলের প্রতিদিনের সংগ্রাম কৌশল (tactics) মূল সংগ্রাম নীতির উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না। এখানে মনে রাখা দরকার—অর্থ-নৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিপ্লবের এক বিশেষ স্তরে মূল শ্রেণী সম্পর্কের বিশ্লেষণের উপর দলের Strategy বা মূল সংগ্রাম নীতি গৃহীত হয়; এবং ওই Strategyকে প্রতিদিনের সংগ্রামে ব্যবহার করার যে কৌশল তারই নাম tactics; এবং যে হেতু মূল সংগ্রাম নীতির কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে ভুল করার সম্ভাবনা সবসময় বর্তমান সেইহেতু প্রতিদিনের সংগ্রামে কোন একটা কৌশলগত প্রশ্নে ভুল বা নির্ভুলতার উপর দলের মূল সংগ্রামনীতির ভুল বা নির্ভুলতা নির্ভর করে না। কমরেড ষ্টালিনের ভাষায় "During any given stage of the revolution there may be defeats and retreats, failures and tactical errors, but that does not mean that the fundamental strategical slogan is wrong." এবং "Consequently, the question of the fundamental slogan of the Party must not be confused with the question of the defeats or setbacks of the revolution at any particular stage of its development." এবং "..........must not be confused with the question of the time and forms of achieving any particular demand arising out of that slogan," (Problems of Leninism). কিন্তু ইহা হইতে (Tactics) সংগ্রাম কৌশলকে মূল সংগ্রাহ নীতির (Strategy) সাথে সম্পর্কহীন একটা স্বাধীন দার্শনিক সত্তা মনে করা Pragmatismেরই নামান্তর। তৃতীয়তঃ দলের মতবাদ ও কৌশলগত বিচ্যুতির প্রকৃতি নির্দ্ধারণ অর্থাৎ ভুল করার সঠিক কারণ নির্দ্দেশের পথে পার্টির শ্রেণী চরিত্রকে আর একবার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা, কারণ রাজনৈতিক দলের পক্ষে দুই ধরণের বিচ্যুতি ঘটা সম্ভব, (১) দলের মতবাদ (Theory) বিশ্লেষণে, চিন্তাপদ্ধতি ও বিচার

অজয় ঘোষ চক্রের সংস্কারবাদ মূলতঃ যোশীর সংস্কারবাদ হ'তে অভিন্ন

বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে মার্কসবাদের মূল নীতি হতে বিচ্যুতি। এই ধরণের বিচ্যুতি ঘটলে বুঝতে হবে ইহা মার্ক্সবাদ ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী চরিত্রের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে দলকে বা দলের নেতৃত্বকে সংশোধনের পথে শক্তিশালী করে নয়, পরন্তু তাকে নিশ্চিহ্ন করা। (২) মূল মতবাদ ও চিন্তাপদ্ধতির ক্ষেত্রে সঠিক থেকেও বাস্তব ঘটনাবলী অনুধাবন ও তাকে পরিবর্ত্তিত করার ব্যাপারে ভুল করা; এ ক্ষেত্রে প্রত্যক সাম্যবাদী কর্ম্মীর অবশ্য কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে দলকে তার ভুলভ্রান্তি শুধরিয়ে ও আভ্যন্তরীন সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠে সঠিক পথে বিপ্লব পরিচালনার কাজে সক্রিয় সহায়তা করা।

ভুলের মিছিল

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটীর মতবাদ (Theory) ও কার্য্যাবলী ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখা যাক্ এই পার্টি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ঠিক কি না। তাদের স্বীকৃতি অনুযায়ীই একথা বলা চলে যে এই পার্টি তার জন্মের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত (অজয় ঘোষ প্রমুখদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) তার মূল সংগ্রাম নীতি (Strategy) ও সংগ্রাম কৌশল (Tactics) নির্দ্ধারণের ব্যাপারে ক্রমাগত একবার দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ ও একবার উগ্রবামপন্থাজনিত ভুল করে এসেছে—অর্থাৎ দলের Theory জন্মের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল ধরে ভুল ছিল। এবং প্রতিবারই পুরোন ভুলের সমালোচনা (?) করতে গিয়ে আগের নেতৃত্বকে অমার্ক্সবাদী চিন্তাধারার বাহক বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর থেকে দুটো জিনিষ প্রমাণ হয়।—(১) এতদিন ধরে বিভিন্ন কাজ ও সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে দলের Guiding principle ও চিন্তাধারা মার্ক্সবাদ বিরোধী ছিল। অর্থাৎ পার্টির চিন্তায় ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়নি। আমরা জানি শ্রেণীস্বার্থসম্পর্কহীন কোন চেতনার অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে কমিউনিষ্ট পার্টির চিন্তাপদ্ধতি এতদিন ধরে শ্রমিকশ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন না কোন শ্রেণী বা উপশ্রেণীর চিন্তাপদ্ধতি হতে বাধ্য। (২) শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী চিন্তাধারা অনুসারে এতদিন ধরে কাজ করার মধ্য দিয়ে যে সংগঠনশক্তি ও party structure গড়ে তোলা হয়েছে তাকে কোন

দলের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন ভুলের ইতিহাস

মতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার যোগ্যতার সবচেয়ে সচেতন অংশকে নিয়ে গঠিত কমিউনিষ্ট পার্টি বলা যায় না। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত পাতিবুর্জোয়া সুলভ উগ্রবামপন্থীয় নীতি অনুসরণ-ফলে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার বদলে ও সংস্কারপন্থী-বিরুদ্ধবাদী জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে (Neutralise) করার জন্য চেষ্টা করার বদলে নিজেরাই Sectarianismএর পথ বেয়ে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলো, কমিউনিজম সম্বন্ধে জনতার মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার কাজে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সাহায্য করলো। এবং সর্ব্বোপরী আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনসাধারণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উপর নেতৃত্ব আরও পাকাপাকিভাবে কায়েম করতে সুযোগ দিল। সেদিনের সে ভুলের মাশুল সাম্যবাদীদের আজও কড়ায় ক্রান্তিতে গুণে দিতে হচ্ছে। এই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে ১৯৩৪ সালের পর থেকে পার্টি দক্ষিণপন্থীয় সংস্কারবাদের পথে পা বাড়ালো। সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের যুগে বুর্জোয়া গনতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় বিপ্লবে সংগ্রামের মূল নীতি ও কৌশল সম্বন্ধে লেনিনবাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে মুখে না হলেও কার্য্যতঃ প্রেথানভের জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে যুক্ত ফ্রন্ট এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের নীতি গ্রহণ করলো। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে নিয়ে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের বদলে সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে "জাতীয় ফ্রন্ট" গঠনের কাজে অগ্রণী হলো। "কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই" অর্থাৎ কংগ্রেসের Capito-Feudalist নেতৃত্ব ও লীগের Feudo-Capitalist নেতৃত্বের মিলনের পথেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সফলতা অর্জ্জন করতে পারে এইমত প্রচারের মারফৎ জনস্বার্থের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করলো। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও Com. Lenin, Stalinয়ের মূল শিক্ষাকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন করে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে আওয়াজ তুললো; এইভাবে পার্টি Revisionismএর আবর্ত্তে ডুবে গেলো। ১৯৪২এর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কারী জনসাধারণও বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলিকে বিদেশীদের গুপ্তচর বলে আখ্যা দিল এবং কমিউনিজমের প্রতি দেশের বেশীর ভাগ লোকের মনে ও বিশেষ করে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মনে এক ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তুললো। আজকের অবস্থার নজির দেখিয়ে অনেকে এ সত্য অস্বীকার করার প্রয়াস করতে পারেন। আমরা তাদের অতীত লাঞ্ছনার ইতিহাস স্মরন করিয়ে দিতে চাই না, তবে এ কথাই বলবো যে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি গুলির সাফল্য ও কার্য্য কলাপই ভারতবর্ষেও কমিউনিষ্টদের (popularity) সুনাম বাড়িয়েছে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আপোষ রফার মারফৎ কংগ্রেসের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন ক্ষমতা হস্তগত করে জনতার প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করলো তখন এই পার্টি মাউণ্টবেটেন awardকে "One step forward" বলে অভিহিত করলো। রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণের প্রশ্নকে সোজাসুজি চাপা দিয়ে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বুর্জোয়াদের দুইভাগে ভাগ করলো—একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া গোষ্ঠী, যারা পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের দালাল বনে গিয়েছে, যার নেতৃত্ব করছিলেন সর্দ্দার প্যাটেল ও অন্যদিকে "প্রগতিশীল," "গণতান্ত্রিক," জাতীয় বুর্জোয়াদের গোষ্ঠ যার নেতৃত্ব করছেন নেহরুজী। এবং এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আওয়াজ তুললো "All support to Nehru. Build up People's Democratic Republic."

নেহেরুকে আশ্বাস দেওয়া হ'ল প্যাটেলচক্র সম্বন্ধে ভয় পাবার কিছু নাই। কারণ ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর দল, শোষিত জনসাধারণের মুক্তিদাতা কমুনিষ্ট পার্টি তার সহায় রয়েছে। এইখানেই শেষ নয়। পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে "ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট" গঠনের মারফৎ ধীরে ধীরে "গণতান্ত্রিক উপায়ে" নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার অভিনব থিওরীর আবিষ্কার এবং এইভাবে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী তত্বের সমাধি রচনা করার অপচেষ্টা করা হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত রণদীভে নেতৃত্বের ভুলত্রুটির সম্বন্ধে এই পার্টির বর্ত্তমান নেতৃত্ব (অজয় ঘোষ) যা' বলেছেন তাতে প্রমান হয়, পার্টি যে নীতি ও আদর্শ নিয়ে চলছিল তা আদৌ মার্ক্সবাদ সম্মত নয়।

বিপ্লবের স্তর-নির্ণয়ের মুলপ্রশ্ন—রাষ্ট্রক্ষমতা

সত্যিকারের কম্যুনিষ্টদের কাছে উপরোক্ত আলোচনা কম্যুনিষ্ট পার্টি নামধারী এই দলটির আসল শ্রেণী চরিত্র বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যেহেতু কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান নেতৃত্ব তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে যে এবার পার্টি জোশীর সংস্কারবাদী ও রণদীভের ট্রটস্কী-টিটোবাদী চিন্তাধারার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের মূলনীতি সম্মত চিন্তাধারা ও কার্য্যক্রম গ্রহণে সক্ষম হয়েছে, সেই হেতু বর্ত্তমান নেতৃত্বের দ্বারা রচিত ও সারা পার্টি সম্মেলনে গৃহীত মতবাদ ও কর্ম্মসূচী বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। দেখা যাক্ বহু বিঘোষিত জোশীর সংস্কার বাদের সাথে পার্টির বর্ত্তমান রাজনৈতিক মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গির মুলগত কোন পার্থক্য আছে কিনা। কমরেড লেনিন বলেছেন "The main question of every Revolution is the question of state power" এবং কমরেড ষ্ট্যালিন ইহাকে আরও পরিস্কার ভাবে ব্যাখা করে বলেছেন—"In the hands of which class, or which classes is power concentrated; which class, or which classes must be overthrown; which class or which classes must take power—such is the main question of every Revolution." বিপ্লবের স্তর ও সেই স্তরে মূল রাজনৈতিক আওয়াজ (strategical slogan) কি হবে তা সঠিক ভাবে নির্ধারন করতে হলে, উপরোক্ত বিষয়গুলির যথাযথ অনুধাবন ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই একমাত্র সম্ভব। কাজেই বিপ্লবের স্তর নির্ণয় করার সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণীচরিত্র ও ইহার সাংগঠনিক রূপ (form of the administrative machinery) বিচারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি চাপা দিলে তাহা আর যাহাই হোক শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী বা মার্কসবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরিচায়ক নয়। কংগ্রেসের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব কিনা? এরা আমাদের দেশের বুর্জোয়াদের সেই অংশ কিনা, যারা সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা হস্তগত করার আগে পর্য্যন্ত সংস্কার বাদী—বিরুদ্ধবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল (Reformist oppositonal), কংগ্রেসের এই জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষরফার ভিতর দিয়ে ক্ষমতা হস্তগত করে একদিকে বিপ্লবভীতির জন্য ও অন্যদিকে ভারতীয় পুঁজীর বিদেশী লগ্নীপুঁজির সাথে peculiar সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকার দরুন সামন্ত প্রভুদের সাথে হাত

★ লৌহ শৃঙ্খলা মানে অন্ধ বিশ্বাস নয় ★

মিলিয়েছে এবং তাদের আশ্রয় দিয়েছে, না, সামন্ত প্রভুরা ক্ষমতা হস্তগত করার পর বুর্জোয়াদের সাথে হাত মিলিয়েছে অর্থাৎ "whether the Congress bourgeoisie who represented in our country so long the national refcrmist section of the bourgeoisie quite distinct from comprador bourgeoisie who long ago went to the side of Imperialism, achieved political power, whatever may be the limitation of it, through compromise with British Imperialism, joined hands with the feudalists and have given them shelter or the Indian feudalists have achieved political power, joined hand with the national bourgeoisie and have given them shelter. And furthermore, whether the Indian bourgeoisie are handling a state machinery which is a centralised and modernised type of Captialist state machinery. (extracts from speech by Com. Shibdas Ghosh, delivered on 24-3-51).

বিপ্লবের স্তর-নির্ণয়ের নয়া থিয়োরী !

এই সকল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির একটিরও জবাব না দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ প্রশ্নগুলিকে অত্যন্ত সুকৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা যেমন হাস্যকর তেমনি idiotic। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে ওঁরা যে সিদ্ধান্তে উন্নীত হয়েছেন তা' নিম্নোক্তরূপ। যেহেতু ভারতবর্ষ আজও একটি কৃষিপ্রধান দেশ—যেহেতু জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন চাষী শ্রেণীভুক্ত—যেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় চাষবাসের প্রচলন সুরু হয় নাই এবং যেহেতু আজও জমিদারকে জমির খাজনা দিতে হয় (যদিও কিছুদিন পর আর তা' এইভাবে দিতে হবে না), যেহেতু আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে আজও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বর্তমান রয়েছে এবং যেহেতু কংগ্রেসী সরকার বিদেশী পুঁজিবাদী দেশগুলির তাঁবেদারী করছে, সেইহেতু আমাদের বর্তমান বিপ্লব পুঁজীবাদ বিরোধী নয়, ইহা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী। সুতরাং এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে খতম করে বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা, দেশীয় পুঁজিকে Restrict ও Control করার মধ্য দিয়ে দেশের শিল্পোন্নতির অনুকূলে বিকাশলাভ করতে সাহায্য করা, কারণ আমাদের দেশে আজও পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হয়ে যায় নি। কৌশলগত দুএকটি প্রশ্ন ব্যতীত যোশীর সংস্কারবাদের সহিত উপরোক্ত বিশ্লেষণের কোন পার্থক্য আছে কি? কম্যুনিষ্ট কর্মীদের আমরা আর একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ব্যাপারে উভয় সিদ্ধান্তই প্রকাশ ভঙ্গিমার তারতম্য ব্যতীত মূলতঃ এক। উভয়েরই বক্তব্য, ভারতবর্ষের বর্তমান বিপ্লবের স্তর নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধন নয়, কেবল মাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন। উভয়েই দেশের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা স্বীকার করেছে। উভয় নেতৃত্বই বুর্জোয়া শ্রেণীকে Collaborationist ও progressive এই দুই ভাগে ভাগ করেছে। শুধু তফাৎ এইখানে যে, জোশী মনে করতেন নেহেরুজী এই প্রগতিশীল অংশের নেতা, কিন্তু বর্তমানে অজয় ঘোষ চক্র (আসলে জোশী চক্র) তা মনে করেন না। উভয় নেতৃত্বই ভারতবর্ষে পাতি বুর্জোয়াদের একটা বিরাট অংশের (দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলগুলি—সোস্যালিষ্ট পার্টি, কৃষক প্রজা পার্টি ইত্যাদি) বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগতার সম্পর্ককে দেখতে পারনি। কাজেই জোশীর চিন্তাধারা সংস্কারবাদী হয়ে থাকলে বর্তমানেও পার্টি সেই একই সংস্কারবাদী চিন্তার বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছে, একথা যে কোন সত্যিকারের কম্যুনিষ্টদের পক্ষে বোঝা শক্ত নয়। চীনের নজীর দেখিয়ে বলা হয়ে থাকে একমাত্র বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থিতি জনিত Rear base এর সুবিধা ও administrative machineryর প্রকৃতিগত পার্থক্য ব্যতীত, আমাদের সাথে চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূলগত কোন পার্থক্য নেই। চীনের প্রাগবিপ্লব পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে মাওসে তুং যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা নিম্নরূপ—China's localised agricultural economy together with the Imperialist policy of curring up and exploiting China by dividing the country up among themselves into spheres of influence created gaps in the reactionary rule, of which advantage could be taken by the revolutionary forces. (30 years of Com. Party of China), অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এবং চীনাবিপ্লবের মূল সংগ্রাম নীতি (strategy) যা কমরেড মাও সে তুং গ্রহণ করেছিলেন তা নিম্নোক্তরূপ—"All the warlords, bureaucrats, comprador and big landlord classes in collusion with the Imperialists, and that part of the reactionary intelligentsia attached to them are our enemies. Industrial proletariat is the leading force in our revolution. All the semi—proletarian classes and the petty-bourgeoisie are our closest friends. Regarding the vacillating middle classes (here com. Mao Tse-Tung refers to the national bourgeoisie), their right-wing is our potential enemy, and their left-wing our potential friends but we must be constantly on guard lest they disrupt our front." (from the Thirty Years of the Com. Party of China). উপরে উল্লিখিত কমরেড মাও-সে-তুংয়ের চীন বিপ্লবের মূল সংগ্রাম নীতির সংগে, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি চীন বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্য ফ্রন্টের নীতিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে তার কোন সামঞ্জস্য আছে কী? এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করেছে এবং যেখানে 'localised agricultural economy'র বদলে দেশজোড়া একটা কেন্দ্রীভূত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং কৃষিতে ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে সেখানে চীনের নজীর দেখিয়ে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আওয়াজ তোলা সত্যিই হাস্যকর।

নভেম্বর বিপ্লব কি তাহ'লে সমাজ তান্ত্রিক নয়?

লেনিনবাদের শিক্ষা অনুযায়ী বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমবিকাশের পথে সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের দিকে মূলতঃ লক্ষ্য রেখে বিপ্লবের স্তর—নির্ণয় করতে হবে। এবং এই স্তরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের যে প্রশ্ন তাকে কোনমতে মূল strategical slogan এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মারফৎ দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও জমিদারদের পুজিবাদ ঘেঁষা অংশ ক্ষমতা হস্তগত করার ফলে সামাজিক শ্রেণীগুলির পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কম্যুনিষ্ট পার্টি হয় তা বুঝতে অক্ষম নয়ত ইচ্ছে করে বুঝতে চাইছে না। আর এই জন্য রাশিয়ার বিপ্লবের কষ্টিপাথরে যে চিন্তার অসারতা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এদের ক্ষেত্রে সেই চিন্তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে বাধা ঘটে নি—তা হচ্ছে "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ না হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে পারে না।" এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সেদিনের বহু মার্কসবাদী (!) লেনিনের April Thesis এর তাৎপর্য্য বুঝতে সক্ষম হন নি। এবং আজকে ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টি নামধারি দলটির দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি মূলতঃ এক থাকা, এমনকি সামন্ততান্ত্রিক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হওয়ার পূর্বেই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের মারফৎ বুর্জোয়ারা ক্ষমতা হস্তগত করার পর কি কি কারণে ও কি অর্থে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পর্য্যবসিত হয়েছিল এবং নভেম্বর বিপ্লবের আগে ও বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন পর্য্যন্ত "সমস্ত চাষীদের সাথে ঐক্যে"র শ্লোগান দেওয়া সত্বেও নভেম্বর বিপ্লবকে কেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয় ইহা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। প্রাগ নভেম্বর বিপ্লব যুগে সারা রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ যতটুকু হয়েছিল ভারতবর্ষের বর্তমান পুজিবাদী বিকাশের পরিমান প্রায় তার তিনগুণ বেশী হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তখনকার সারা রাশিয়ার মজুরের সংখ্যার (Industrial workers) সাথে বর্তমানে ভারতবর্ষের মজুর সংখ্যার তুলনা করলেই ইহার প্রমাণ মিলবে। সারা রাশিয়ার মজুরদের সংখ্যা তখন ছিল ২,৭৯২,০০০ জন এবং সারা ভারতে (বিভক্ত) মজুরদের সংখ্যা (Industrial workers) ৬,০০০,০০০ জনেরও বেশী এবং কমরেড লেনিন সেদিন কৃষিতে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশের বিচারের ক্ষেত্রে চাষবাস আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় হচ্ছে কি হচ্ছে না এর উপর আদৌ নির্ভর করেন নি। কারণ তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যান নি বা, স্থান ও কালের উর্দ্ধে কোন এক 'আদর্শ' পুঁজীবাদের কোন এক 'আদর্শ' সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ভাঙবার মধ্য দিয়ে কৃষিতে অনুপ্রবেশের ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করছেন না, তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু বিশ্ব পুঁজীবাদী সমাজের অন্তর্গত বিশেষ একটি অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া দেশে (রাশিয়া) ধনতন্ত্রের কৃষিতে অনুপ্রবেশের গতিপ্রকৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাকবিপ্লব যুগে রাশিয়ার অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতি নিম্নোক্ত রূপ ছিল—"Capitalism was developing not only in the towns but also in the country side. The peasantry, the most numerous class in pre-revolutionary Russia, was undergoing a process of disintegration, of cleavage. From among the more well-to-do peasants there was emerging an upper layer of kulaks, the rural bourgeoisie, while on the other hand many peasants were becoming ruined and the number of poor peasents, rural proletarians and semi-proletarians was on the increase. As to the middle peasants their number decreased from year to year······on the other hand one and half million rich Kulak households (out of a total of ten-

(১২র পৃষ্ঠায় দেখুন)

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দাবীর সাথেই প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হইবে।

তাই ভারতবর্ষের আগামী বিপ্লবের লক্ষ্য—দেশীয় বুর্জোয়াদের ক্ষমতার আসন হইতে উচ্ছেদ তথা ধণতন্ত্রের সমাধি রচনা করা কারণ তা না করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক অব্যবস্থা দূর করা এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপুরিত সংস্কারগুলি পূরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিপ্লবের বিরুদ্ধ শক্তি হইল দেশীয় ধনিক শ্রেণী। শ্রেণী হিসাবে ধনিক শ্রেণীই আজ ভারতীয় রাষ্ট্রের রক্ষক, সুতরাং সেই রাষ্ট্রের উচ্ছেদের সংগ্রামে তাহাদের কাছ হইতে শ্রেণী হিসাবে সাহায্য পাওয়ার আশার সংঘে বৈপ্লবিক দর্শনের কোন সম্পকই নাই। তার জন্য এ কথা বলা চলেনা যে ব্যক্তি হিসাবে কোন লোকই ধনিক শ্রেণীর বাহিরে আসিয়া এই স গ্রামে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। তবে ব্যক্তির অংশগ্রহণে শ্রেণী বা শ্রেণীর কোন এক অংশের অংশগ্রহণ বলিয়া ভূল করিলে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথচ আজ সেটা ভুলিয়া গিয়া যোশীমার্কা সংস্কারবাদের প্রভাবে কেউ কেউ আশা করিতেছেন যে. এই রাষ্ট্র বিরোধী সংগ্রামে শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অংশকে পাওয়া যাইবে। এই সর্বনাশা চিন্তা ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেসের একাংশ তথা কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি ও দক্ষিণ পন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাট সোস্যালিষ্ট পার্টির (প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি) সাথে মিলন ও সহযোগীতায় ধনিক কংগ্রেসের পরিবর্ত্তে ধুরন্ধর প্রজা সোস্যালিষ্টদেরই কৌশলে ধনতন্ত্র রক্ষায় সহায়ক হইবে।

প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির স্বরূপ সর্বোদয় পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়াই সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্যাসিবাদী কায়দায় উন্নত কৌশলে ধ্বংসম্মুখ ধনতন্ত্রকে টিকাইয়া রাখার ব্যপারে সিদ্ধহস্ত এই প্রজা সোস্যালিষ্টের দল। এদের কংগ্রেস বিরোধীতা যে ক্ষমতার কোন্দল ছাড়া আর কিছুই নয় অনেক সময় গরম গরম 'সংগ্রামের' বুলি কপচাইয়া সংগ্রামশীল জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস মাত্র। এমনকি অনেক সময় জনসাধারণের কাছে নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য তথাকথিত 'সংগ্রামের' মহড়া দিতেও যদিও সেই সব সংগ্রামই শেষ পর্য্যন্ত মধ্যপথে হয় বন্ধ করিবে; আর এদের নেতৃত্ব ছাড়াইয়া সংগ্রাম আগাইয়া যাইতে থাকিলে পিছন দিক হইতে ছুরিকা চালাইয়া সংগ্রাম বানচাল করিবে) ইারা কম যান না। সে ক্ষেত্রে এ হেন সেয়ানাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার পরিবর্ত্তে ইহাদের সহিত যুক্ত ফ্রন্ট' গঠন ও সহযোগীতার প্রশ্ন কংগ্রেসকে শাসণ ক্ষমতা হতে (নিয়মতান্ত্রিকতার পথে) অপসারিত করিলে ও তাহাতে ভারতের ধনিকতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হইবে না। তাই পুজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদের সংগ্রামে পুজিবাদ ও বিপ্লবী জনশক্তির মধ্যে আপোষপন্থী ধনিকতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন দালাল এই প্রজা সোস্যালিষ্ট দল সমূহকে জনসাধারণ হইতে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

আগামী বিপ্লবের রণনীতি

পূজিবাদী রাষ্ট্র বিরোধী এই সংগ্রামের নেতৃত্ব স্বাভাবতই ভারতের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীকে করিতে হইবে—তাহার সব চাইতে অগ্রগামী ও সচেতন অংশ শ্রমিক শ্রেণীর মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলের মারফৎ। কিন্তু যেহেতু আজও ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু দাবী অপুরিত রহিয়া গিয়াছে সেই হেতু বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্তরের শ্রেণী সমূহের বিপ্লবী সম্ভাবনাও রহিয়াছে। তাই বিপ্লবের এই স্তরে তাহাদের ভূমিকাকেও যথা যোগ্য স্থান দিতে হইবে। উপরন্তু বিপ্লবকে সফল করার জন্য জনগণের সচেতন ও সক্রীয় সমর্থন বিপ্লবের পিছনে টানিয়া আনিতে হইবে। সংগ্রাম যতই আগাইয়া যাইতে থাকিবে ততই সংগ্রামী সংগঠন ও রূপান্তরীত হইতে থাকিবে অধিকতর ক্ষিপ্রতা, শৃঙ্খলা ও দক্ষতা লইয়া। কৃষক সমাজের মধ্যে ধনী চাষী স্বভাবতই গ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান ঘাঁটি। সংগ্রাম এমন ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে যাহাতে মধ্যবিত্ত চাষীকে সংগ্রামে পাওয়া যায়—শেষ পর্য্যন্ত এদের কোন অংশকে না পাওয়া গেলে অন্ততঃ পক্ষে নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা গেল বিপ্লবের পক্ষের শক্তি হইতেছে শ্রমিক শ্রেণী, গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষী ও সহরের মধ্যবিত্ত। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া দেখিলে প্রতিয়মান হইবে ভারতবর্ষের আগামী বিপ্লবের রণনীতি দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—বিপ্লবের মূল লক্ষ্য—পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ও বিপ্লবের মূল শক্তি—শ্রমিক শ্রেণী, বিপ্লবী মিত্র—নিজের দেশের গরীব ও মধ্যচাষী এবং দরিদ্র শ্রমজীবি জনসাধারণ আর দুনিয়ার মেহনতী মুক্তিকামী জনসাধারণ; আঘাত হানার প্রধান দিক—পোর্ট বুর্জোয়া শক্তিগুলি, যাহারা পুজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমজীবি জনতার মধ্যে আপোষকামী শক্তি তাহাদের জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করা; শ্রেণী বিন্যাসের নীতি—শ্রমিক ও গরীব চাষী জনসাধারণের মৈত্রী। বিপ্লবের এই নীতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই রণনীতি।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিসমাপ্তি তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রা

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এখনই আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্বনি তুলিব কি না? না অবশ্যই নয়, কেননা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে সমস্ত সংস্কার বা দাবী অপুরিত রহিয়াছে, তাহা প্রতিষ্ঠিত বা পুরণ না করিয়া অগ্রসর হইতে চাহিলে বর্ত্তমান বিপ্লবের পশ্চাতের বিরাট গণতান্ত্রিক শক্তি সবাবেশের ক্ষেত্র সংস্কুচিত হইয়া—পরিণামে বিপ্লবে ব্যহত করিতে পারে। তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপুরিত দাবীগুলিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর মধ্যে গ্রহণ করিয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যেখানে শেষ হইয়াছে—তাহার পর হইতেই সুরু করিতে হইবে।

বিপ্লবের বর্ত্তমান স্তরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ও সেই আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণী সমাবেশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন আজ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ ঘটাইয়া জনজীবনের প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একটি সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার মাধ্যমে পরিচালনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে কোন গণতান্ত্রিক দলকেই আগাইয়া আসিতে এবং তা কার্য্যকরী করার জন্য প্রতিনিয়ত সচেষ্ট হইতে দেখা যায় না। এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী গণতান্ত্রিক দলগুলির চাইতে শ্রমিক শ্রেণীর সত্যিকারের ও কার্য্যকরী দলের অভাব। ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার শ্রমিক শ্রেণীর দলের মতবাদিক নির্ভুলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সংগঠণিক দিক দিয়া কায্যকরীভাবে নেতৃত্ব ভার লইতে আগাইয়া আসিয়াছে—এস, ইউ, সির প্রচেষ্টার মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেনীদলের অভাব মোচনের সম্ভাবনা দিনের পর দিন সার্থক হইয়া উঠিতেছে।

এস, ইউ, সি'র গড়িয়া ওঠার তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সুরু করার পথে আজও যে সমস্ত শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে—তাহাদের বিভ্রান্তিকর মতবাদের অসারতা প্রমাণ ও সাংগঠণিক দিক হইতে শ্রমিক শ্রেণীর দলকে শক্তিশালী করার প্রশ্নই আজ সর্বাগ্রে সমাধান করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে যে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব কারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে; প্রগতিশীল আন্দোলনের অগ্রণী অংশ হিসাবে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীকে আগাইয়া,—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ভুখা গরীব চাষী ও শোষিত মেহনতী জনসাধারণের যথাযথ অংশ গ্রহণ করানোর জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র, স্বার্থ ও বৈশিষ্ট লইয়া গঠিত মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলই একমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সঠিক নেতৃত্বভার লইতে সক্ষম—তা সে দল যত সংখ্যা লঘিষ্টই হউক না কেন। বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব ভ্রান্ত নীতিতে গড়িয়া ওঠা বা পরিচালিত সংখ্যাগরিষ্ট দলের উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না—তার জন্য চাই বৈজ্ঞানিক মত ও পথের অনুসরণ। মহান নভেম্বর বিপ্লবের এই শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ভারতের বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র, স্বার্থ ও বৈশিষ্ট লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে! ভারতের বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী প্যারী কমিউনার্ডদের বংশধর হিসাবে নভেম্বর বিপ্লবের সুমহান সংগ্রামী ঐতিহ্যে এবং নয়া গণতান্ত্রিক দেশের জনগণের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভারতীয় ধনিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে—শ্রমজীবি জনসাধারণের জেহাদকে রোধ করিবার শক্তি দুনিয়ার কোন প্রতিক্রীয়াশীলদের নাই—জয় সুনিশ্চিত জানিয়াই আজ সংগ্রামের দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ বৈপ্লবিক অভিনন্দন দুনিয়ার শোষিত মেহনতী জনসাধারণ নভেম্বর বিপ্লবের দেশ সোভিয়েট শ্রমিকশ্রেণীকে জানায়

(১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

milllon peasant households) concentrated in their hands, half the total sown area of the peasants. This peasant bourgeoisie was growing rich by grinding down the poor and middle peasantry and profiting from the toil of agricultural labourers, was developing into rural capitalists" (C,P S.U.(B))

আমাদের দেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশের পরিমান তদানীন্তন রাশিয়ার তুলনায় কমত নয়ই বরং তার অনেক বেশী। ১৯৪৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে কৃষিকাজে যত লোক খাটত তার মধ্যে শতকরা ৩৭ জনেরও কিছু বেশী লোকের কোন জমি ছিল না; ১৭½ জনের প্রত্যেকের জমির পরিমান তিন বিঘারও কম ছিল, এবং যাদের ১৫ বিঘা জমি আছে এমন কৃষক পরিবারের সংখ্যা হল মোট কৃষক পরিবারের শতকরা ১১ ভাগ। কাজেই দেখা যাচ্ছে মোট কৃষক পরিবারের পরিবারের শতকরা ৫৪ জনেরও বেশী লোকের কোন জমি নেই বললেই হয় এবং শতকরা ১৪ জনের অধিকারে মোট জমির শতকরা ৬৩ ভাগেরও বেশী চলে গিয়েছে। ১৯৪৫ থেকে ৫২ সাল পর্য্যন্ত ধনতন্ত্রের বিকাশ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা সমূহ হতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে কম্যুনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটির দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি মার্ক্সবাদ-বিরোধী ত বটেই উপরন্তু ইহা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী চরিত্রের পরিচায়ক। (এই দলের সাংগঠনিক নীতির ক্ষেত্রেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় "গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের" নীতি এরা মুখেই স্বীকার করেছে এবং কার্য্যত দলকে 'গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হলে আসলে তা যে দলের সাধারণ সভ্যদের সাথে নেতৃত্বের দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল এবং নেতাদের সাথে কর্মীদের এই দ্বান্দিক সম্বন্ধ যে কাগজে পত্রে "খুব ভালো" ও "গণতান্ত্রিক" কনষ্টিটিউশান গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আপনা হতে গড়ে ওঠে না—এবং ইহা যে একান্তভাবে সাধারণ সভ্যদের রাজনৈতিক সচেতনতার মান যথেষ্ট উন্নত করার উপর নির্ভরশীল এই সত্যকে অস্বীকার করেছে) এর প্রমানের জন্য বেশী কষ্ট পেতে হবে না যদি আমরা কলিকাতায় অনুষ্ঠীত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের ঘোষনা—পার্টিকে এতদিনের পর যথাযথ ভাবে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠীত করা হল,—এর সাথে রনদীভে আমলে নেতৃত্বের কার্য্যকলাপ ও তার উপর বর্তমান নেতৃত্বের সমালোচনা লক্ষ্য করি। (আমরা বরাবর বলে এসেছি, এই পার্টি তার দল গঠনের সুরু থেকেই কর্মীদের মধ্যে Blind practice এর নীতিকে চালু করেছে। এবং দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও মোহ সৃষ্টি করাকে দলের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এই দল আজ মুলতঃ পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন দুইটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর উপরের দিকে রয়েছে একদল মুষ্টিমেয় আত্মকেন্দ্রীক Theoreticians ও নীচের দিকে বেশীরভাগ অন্ধ ও 'ভালো কর্মীর' দল। ফলে দল চিন্তা-ক্ষেত্রে formal logic এর পথ ধরে এগুতে বাধ্য।

A group of self-confined abstract theoreticians are guiding the rest of the party members and workers in an absolutely authoritarian manner, which has given birth to a bureaucratic leadership at tne top and by this, along with other reasons discussed above, has completely destroyed the possibility of forming a working class party, the Communist party worth the name, এই সত্যকে স্বীকার করতে না চাওয়া সাচ্চা কমিউনিষ্ট চরিত্রের লক্ষণ নয়। একমাত্র ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ যাদের লক্ষ্য এবং সেই জন্য বড়দলের সুবিধা ত্যাগ করতে যারা ভীত, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল গঠন করার আসল উদ্দেশ্য কি তা যারা জানে না তারাই আজও নানারকম আত্মপ্রবঞ্চনামূলক যুক্তি তর্কের অবতারনা করে আসল সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে এবং নূতন করে সাম্যবাদীদল গঠনের কষ্টকর গুরুদায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।

পাক-ভারত সম্পর্ক

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

অবরোধের প্রশ্ন প্রথম উত্থাপন করেন তথা কথিত গণতান্ত্রিক পুজিবাদী রাষ্ট্র সমূহ সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্মের সাথে সাথে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় পশ্চিম ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে অর্থ-নৈতিক অবরোধের বেড়াজালে পিষে মারার কম চক্রান্ত করেনি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীরা। ভারতের প্রতিবেশীর নয়া চীনকে অর্থ-নৈতিক অবরোধের মারফৎ অঙ্কুরে বিনষ্ট করার সমস্ত মার্কিনী ষড়যন্ত্র আজ ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। নূতন জাগ্রত নয়াগণতান্ত্রিক দেশ সমূহ সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে মুক্ত বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিক্রীয়াশীলদের সমস্ত চক্রান্ত উপেক্ষা করে আজ সাম্রাজ্যবাদী বাজারে এক বিরাট সঙ্কোচন এনে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীরা বাজার দখল ও যুদ্ধ ঘাটি নির্মানের জন্য আজ তাই দিশেহারা হয়ে অনুন্নত দেশগুলিতে আভ্যন্তরীন বিরোধ ও দুর্বলতার সুযোগের জন্য ওত পেতে আছে। পাকিস্থানকে অর্থনৈতিক অবরোধ করে সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটিতে পরিণত করতে সাহায্যই করা হবে—পাকিস্থান সরকারকে জব্দ করা তাতে যাবে না।

পুঁজিবাদী সরকারের তাঁবেদারি

বিস্মিত হতে হয় কতিপয় বামপন্থী দলের এই অর্থ নৈতিক অবরোধের প্রশ্নে সায় দেওয়ায়। যদিও এদের কমিউনিষ্ট পার্টির চাইতে কমিউনিজমের প্রতি বিদ্বেষ সর্বজন বিদিত। মুখে সাম্যবাদ ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের বা মার্কসবাদের অনুগামী বলে প্রচার করতে কেউই কম যান না।। কমিউনিজম-বিরোধী এই 'বামপন্থী'দের 'বিপ্লবী কর্মপন্থা' শুধু প্রজা-সোস্যালিষ্ট নয় সাম্প্রদায়িক শক্তিদের সাথেও আজ এক যুক্ত ফ্রন্টে মিলিত হয়েছে— অভূতপূর্ব গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে। গণ আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহের কার্য্যকলাপ আজ আর বিশেষ করে কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। তাই অর্থ নৈতিক অবরোধের প্রস্তাবকারীদের প্রস্তাবে এই অবরোধের জন্য টাটা বিড়লার সরকারের পিছনে জনমত গঠনের দ্বারা শক্তি সমাবেশের প্রতিশ্রুতিও ঘৃণ্য ভাবে স্থান পেয়েছে।

সংখ্যালঘুদের সমস্যা যে ভারত ও পাকিস্থান সরকার মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছে—আজ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে 'অর্থ-নৈতিক অবরোধ' তথা 'প্রয়োজন বোধে যুদ্ধের জন্য সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্নকারী ভারত সরকারের হাত শক্ত করার জন্য বিভ্রান্ত অবরোধকারীর দল উঠে পড়ে লেগেছে। এতে 'পাকিস্থান' সরকার 'সোজা' হোক বা না হোক দুই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উভয় 'রাষ্ট্রের' স্বার্থে 'সোজা' করতে সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই। আর পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের জীবন অবরোধের আগে আজই যে ভাবে বিপন্ন তার মাত্রা শতগুণে বাড়াবে মাত্র।

সংখ্যালঘুদের বাঁচার উপায় সুস্থিরভাবে দেখলে একমুহূর্ত্ত সময় লাগেনা। সংখ্যা-লঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের উৎপাত ও উৎপীড়ন ততক্ষণ চলে যতক্ষণ সেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বল থাকে। ভারতের দিকে তাকালে এ কথার সত্যতা মিলবে। ভারতের সংখ্যালঘুদের উপর উৎপাত বা উৎপীড়ন তখনই বেড়েছে যখন গনতান্ত্রিক আন্দোলন শিথিলতা পেয়েছে—গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর পাকিস্থানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই তো সেদিন মাত্র জন্ম নিয়েছে তাতেই সেখানকার সংখ্যালঘু আশার আলোক দেখতে পেয়েছেন—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের কলকাতার ময়দানে বা দিল্লীর লোকসভায় আসফালনে নয়। সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্যও তেমন সেখানকার গণতান্ত্রিক শক্তিই একমাত্র সহায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপ, একমাত্র সরকারের উদাসীনতা বা পক্ষপাতীত্বের রোধ করতে পারে। নয়তো বাইরের কোন শক্তিই তা এসে কোনদিন করে দেয়নি—করে দেবেনা। যারা বাইরে থেকে সাহায্য করতে চায় তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে গণতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। আর সরকারই যেখানে সাম্প্রদায়িক বা প্রতিক্রিয়াশীল তাদের উৎখাতের জন্য নিজেদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা বিপ্লবই একমাত্র পথ। আর এই বৈপ্লবিক প্রস্তুতির পথে যে বাধানিষেধ পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্ত্তন করে এনেছে—তা প্রত্যাহারের জন্যও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে এগুতে হবে—আর এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার জন্য বিদ্বেষমূলক উত্তেজনার রাজনীতির ব্যুহ ভেদ করে করভারে জর্জরিত, সহায় সম্বলহীন সাধারণ মানুষের জীবনকে গণ-তান্ত্রিক প্রতিটি অধিকার সংগ্রামের মারফৎ অর্জন করে অগ্রসর হতে হবে—এক একটি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সমাজ জীবনে সংগ্রামী জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সার্থক করবে।

বার্ড কোং শ্রমিকদের দুর্জয় ★ প্রতিরোধ সংগ্রাম ★

কলিকাতা বার্ড এণ্ড কোম্পানী শ্রমিক ইউনিয়ন আজ সাফল্যের পথে পা বাড়াইয়াছে। দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ড এণ্ড কোম্পানীর শ্রমিকদের উপর কোম্পানী ও ঠিকাদার সর্দ্দারেরা অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া যাইতেছিল। এতদিন কংগ্রেসী 'শ্রমিক দরদী' ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও নেতৃ মিলিয়া শ্রমিকদের শুধু বিভ্রান্তই করিয়া আসিয়াছে। কোম্পানীর সাথে যোগসাজস করিয়া কংগ্রেসী শ্রমিক দরদীরা শ্রমিকদের জঙ্গী সংগঠন গড়িতে দেয় নাই। সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ রাখিয়া ভাগে কারবার ফাঁদিয়াছিল। বার্ড এণ্ড কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফার পাহাড় গড়িয়াছে এই শ্রমিকেরা। তার পরিবর্ত্তে শ্রমিকরা এতদিন পর্য্যন্ত কোম্পানী দ্বারা সরাসরি চাকুরীতে নিয়োগ ও জীবন ধারনের উপযোগী বেতন এবং চাকুরীর স্থায়িত্ব কোনটাই পায় নাই। মুখে মুখে চাকুরীতে নিয়োগ করিয়া কথায় কথায় বরখাস্ত করিয়া ঠিকাদার সর্দ্দারেরা শ্রমিকদের উপর জুলুম চালাইয়াছে নির্মম-ভাবে। সর্দ্দারেরা পোষা গুণ্ডা পালোয়ানের চোখ রাঙানী, কিল, চর, ঘুসি বা লাঠি পিঠে করিয়াই মোট বহিয়া চলিয়াছে এই নিরীহ শ্রমিকেরা। অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া শোষনের চাপে ভাঙ্গিবার মুখে নূতন জঙ্গী ইউনিয়ন সংগঠন করিয়াছে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের লাল ঝাণ্ডার তলে কলিকাতা বার্ড এণ্ড কোং শ্রমিক ইউনিয়ন আজ বার্ড এণ্ড কোম্পানীর সমস্ত শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন করিয়াছে। সংগ্রামের মধ্য দিয়া দালালদের সর্ব রকমের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সমস্ত শ্রমিককে টানিয়া আনিয়াছে লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়নের পতাকার নিচে।

বার্ড শ্রমিকদের এই বৈপ্লবিক সংহতি গোড়া হইতেই কোম্পানী বা সর্দ্দার কাহারও চোখে ভালো লাগে নাই। তাই অক্টোবরের মাঝামাঝি কাটাপুকুরের জঙ্গী শ্রমিকদের (যাহারা ইতিমধ্যেই লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়নের সেরা কর্মি হিসাবে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে) ৪৭ জনকে হঠাৎ কাজে বরখাস্ত করিয়া দেয়। বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনরায় কাজে নিয়োগের জন্য দাবী জানাইয়া সমস্ত আবেদন নিবেদনই কোম্পানী কানে তোলে না। ইউ-নিয়নের কর্মিদের ছাটাইয়ের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ভয় বা নিরুৎসাহের পরিবর্ত্তে দৃঢ়তা আরও বাড়িয়া যায়। সেই দিনই বার্ড কোম্পানীর প্রায় সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্য হইয়া যায়। ইউনিয়নের সভ্য হইয়া প্রত্যেক শ্রমিক শপথ গ্রহণ করে—এবার কাজে বরখাস্ত মুখের কথায় চালাইতে দিবে না—শেষ পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিয়া যাইবে।

গত ২৫শে অক্টোবর পুরাতন লোকের কাজে ৬নং গার্ডেন রীচে অবস্থিত টি, টি, শেড ও টি, ওয়ার হাউসে পচিশ জন নূতন লোক ঢুকাইলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। শ্রমিকেরা এক বাক্যে পুরানো লোকের কাজ নূতন লোক দিয়া না করাইবার জন্য দৃপ্ত কণ্ঠে দাবী করায় সর্দ্দার বাধ্য হইয়া কথা দেয় পরের দিন হইতে আর নূতন লোক ঢুকাইবে না। কিন্তু সর্দ্দার চাল চালার পরের দিনও ঐ নূতন লোকদের কাজে ঢুকায়। এই দিন শ্রমিকেরা বেঁকিয়া দাঁড়াইলে আবার কথা দেয় যে এদের নাম আজকের মত তালিকাবদ্ধ হইয়া গেছে—কিন্তু কালকে আর নূতন লোক নেওয়া হইবেনা। পরের দিনও নূতন লোক ঢুকাইবার চেষ্টা করায় কাজের আরম্ভেই শ্রমিকেরা দৃঢ়পণে প্রতিরোধের জন্য দাঁড়ায়। সর্দ্দারের হুমকিতে শ্রমিকেরা আজ আর টলিল না—তখন সর্দ্দার পোষা গুণ্ডা পালোয়ানদের বেপরোয়া ভাবে শ্রমিকদের উপর আক্রমনের জন্য লেলাইয়া দেয়। কোম্পানীর সাহেব মিঃ ফ্রি ম্যান পালোয়ানদের উস্কানী দিতে থাকে শ্রমিকদের নির্মমভাবে মারপিট করার জন্য। দেখতে দেখতে সমস্ত শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গুণ্ডাদের রুখিয়া দাঁড়ায়। শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে মূর্ত্তি দেখিয়া সর্দ্দার ভয়ে গাড়ী লইয়া চম্পট দেয় আর মিঃ ফ্রি ম্যান নিজের শেড হইতে পলাইয়া আত্ম-গোপন করেন; গুণ্ডারা দাঙ্গা করিতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। শ্রমিকদের মধ্যে মনোবল আরও বাড়িয়া যায়। গুণ্ডাদের আক্রমনে যে সাত জন শ্রমিক জখম হইয়াছিল ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী খবর পাইয়া তাহাদের লইয়া পোর্ট পুলিশের কাছে আক্রমণ কারী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে 'ডাইরী' করিতে গেলে পুলিশ কমরেড ব্যানার্জী সহ ঐ সাত জন আহত শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে। থানার বড় কর্ত্তা শ্রমিকদের শাসাইয়া বলেন ইউনিয়ন করার মজা দেখাবেন, এক রাত্রের মধ্যে ইউ-নিয়নের নেতাদের পাল্টা দাঙ্গার দায়ে আটক করিয়া শ্রমিক ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দিবেন বলিয়া। লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়নের অন্যতম নেতা কমরেড রবি বসু ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া জামিনে তাদের খালাস করিতে গেলে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ দিনই আরও তের জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের খানা তল্লাসী চলে শ্রমিকদের বস্তিতে বস্তিতে। বাড়ী হইতে কয়েকজন শ্রমিককে তার পরের দিন গ্রেপ্তার করে এবং তার পরের দিন কর্মরত অবস্থায় আরও ছয় জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(১৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তারে শ্রমিকদের অসন্তোষ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। কলিকাতায় বার্ড এণ্ড কোম্পানীর সমস্ত সেকশনে ধর্মঘট সুরু হইয়া যায়। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিবসে কোম্পানীর টনক নড়ে। সাথে সাথে সরকারী শ্রম দপ্তরের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। এত দিনের বহু আবেদন যা করিতে পারে নাই, দুই দিনের সুসংগঠিত ধর্মঘট কোম্পানী ও সরকারী শ্রম দপ্তরের সাথে ইউনিয়নের প্রতিনিধি-দের সাথে আপোষের পথে বাড়াইতে বাধ্য করিয়াছে।

গত ৩০শে অক্টোবর ইউনিয়নের প্রতিনিধি, কোম্পানীর হেড অফিসের বড় সাহেব ও সরকারী শ্রম দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার এক ত্রিদলীয় বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ঠিকাদার সর্দারের দাস প্রথা তুলিয়া দেওয়ার দাবী সর্বাগ্রে উত্থাপন করেন ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত পরামর্শদাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি আরও দাবী করেন যে ছাটাই শ্রমিকদের কাজে পূর্ণ বহাল, বরখাস্ত শ্রমিকদের কাজে পুনর্নিয়োগ এবং পুলিশ কেসে আটক বা জামিনে মুক্ত বরখাস্ত সমস্ত শ্রমিককে খালাস পাওয়ার সাথে সাথে কাজে লইতে হইবে। তাছাড়া শ্রমিকদের মাহিনার হার বাঁধিয়া দিতে ও প্রত্যেকের নিজস্ব রেশন কার্ডের ব্যবস্থা এবং মাহিনা কাজের পরে বা বিশ্রামের সময় কাজের জায়গায় কোম্পানীর কর্মচারীর সামনে বণ্টন করিতে হইবে। উপরোক্ত সমস্ত দাবী মানিয়া লইলে ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ইউনিয়ন প্রতিনিধি দেন। সরকারী শ্রমদপ্তরের ডেপুটি লেবার কমিশনারের সম্মুখে এ দাবীগুলি লিখিত-ভাবে বার্ড এণ্ড কোং হেড অফিসের বড় সাহেব মিঃ ব্ল্যাকার মানিয়া লওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

বার্ড শ্রমিকদের এত অল্পদিনের মধ্যে দাবী পুরনের জন্য সমস্ত খিদিরপুরের শ্রমিকদের মধ্যে এক ব্যাপক সাড়া দেখা দিয়াছে। বার্ড শ্রমিকরা যে কায়দায় জঙ্গী ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে—সংগ্রামে যে কৌশল ও লৌহদৃঢ় অটুট মনোবলের পরিচয় দিয়াছে সর্বোপরি শমিকদের চেতনা যেভাবে জাগ্রত শক্তিতে পরিণত হইয়াছে—আগামী দিনের বাঙ্গালার তথা ভারতের শ্রমিকরা তাহা অনুসরণ করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির উনবিংশ কংগ্রেসে

★ কমরেড জে, ভি, ষ্ট্যালিনের ভাষণ ★

[সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে ১৪ই অক্টোবর কমরেড জে, ভি, ষ্ট্যালিনের বক্তৃতামঞ্চে আবির্ভাবের সাথে সাথে সমবেত সকলেই তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি ক্রমে বিপুল জয়ধ্বনিতে পরিণত হয়। চারিদিক হ'তে উৎফুল্ল আওয়াজ ওঠে: "কমরেড ষ্ট্যালিন দীর্ঘজীবি হোন!" "জয় কমরেড ষ্ট্যালিনের জয়!" "মহান ষ্ট্যালিন জিন্দাবাদ!"]

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গুরু গম্ভীর স্বরে কমরেড জোসেফ ভিসারিওনোভিচ ষ্ট্যালিন ভাষণে বলেন:

কমরেডগণ,

যে সব ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পার্টি ও গোষ্ঠির প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের কংগ্রেসকে সম্মানিত করেছেন কিম্বা কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছেন, তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ শুভেচ্ছাবাণী, তাঁদের সাফল্য-কামনা, তাঁদের আস্থার জন্য আমাদের কংগ্রেস পক্ষ হ'তে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ঐ আস্থার সবিশেষ মূল্য আমরা স্বীকার করি। এই আস্থার দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে আমাদের পার্টির জনগণের ভাস্বর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শান্তি বজায় রাখার সংগ্রাম।

এই কথা ভাবলে ভুল করা হবে যে, আমাদের পার্টি যখন এতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তখন তার আর সমর্থন লাভের প্রয়োজন নেই। এ কথা সত্য নয়। বিদেশের জাতি সমূহের ভ্রাতৃত্বমূলক আস্থা, সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রয়োজন আমাদের পার্টির ও দেশের সব সময়ই ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

ঐ সমর্থনের স্পষ্ট চারিত্রিক লক্ষণ এই যে, আমাদের শান্তিমুখী আশা আকাংখার প্রতি যে কোন সৌভ্রাতৃত্বমূলক পার্টির সমর্থনের মানেই সাথে সাথে তাদের নিজেদের জনগণের শান্তিরক্ষার সংগ্রামেরও সমর্থন। ১৯১৮-১৯১৯ সালে বৃটিশ বুর্জোয়ারা যখন সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ করল, সেই সময় ব্রিটিশ শ্রমিকরা "রুশিয়া থেকে হাত গুটিয়ে আন" আওয়াজ তুলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছিল। তার মানেই সমর্থন: সর্বপ্রথমে তাদের জনগণের শান্তির জন্য সংগ্রামে সমর্থন এবং তার পরে সোভিয়েট ইউনিয়নেরও সমর্থন। কমরেড থোরে ও কমরেড তোগলিয়াত্তি যখন বলেন যে, তাঁদের জনগণ কখনো সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না (তুমুল হর্ষধ্বনি), তখন সেই ঘোষণা হচ্ছে সমর্থন: সবার আগে ফ্রান্স ও ইতালীর শান্তির সংগ্রামে লিপ্ত শ্রমিক ও কৃষকের এবং তার পরে সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রের শান্তি মুখীন প্রয়াসেরও সমর্থন। ঐ পারস্পরিক সমর্থনের মূলে আছে এই সত্য যে, আমাদের পার্টির স্বার্থের সঙ্গে শান্তি-কামী জাতিগুলির স্বার্থের বিরোধ থাকা দূরে থাক, উভয়েরই স্বার্থ অভিন্ন। (তুমুল হর্ষধ্বনি)। সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে তার নিজের স্বার্থ সাধারণভাবে বিশ্ব শান্তির আদর্শের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

স্বভাবতই আমাদের পার্টি ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টিগুলির ঋণ নিয়েই খালাস হতে পারে না। প্রতিদানে আমাদের পার্টিও তাদের সমর্থন দেবে, সমর্থন করবে তাদের জন-গণের মুক্তি-সংগ্রাম, শান্তি রক্ষার সংগ্রাম। ঠিক এই কাজই যে আমাদের পার্টি করছে তা কারো অজানা নেই। (তুমুল হর্ষধ্বনি) ১৯১৭ সালে আমাদের পার্টির হাতে শাসনের বলগা এসে যাবার পরে, পুঁজিবাদী ও ভূস্বামিদের নির্য্যাতনের অবসান ঘটাবার জন্যে আমাদের পার্টিকর্তৃক কার্য্যকরী বব্যস্থা অবলম্বন করার পরে, আমাদের পার্টির সাহস ও সাফল্যের প্রশংসা করতে গিয়ে ভ্রাতৃস্থানিয় পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা আমাদের পার্টিকে বিশ্ব-বৈপ্লবিক ও শ্রমিক আন্দোলনের "অগ্রগামী বজ্র-বাহিনী" বলে অভিহিত করেছিলেন। এই নাম-করণেরই মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই আশাই পোষণ করেছিলেন যে, "বজ্র-বাহিনী" সাফল্য পুঁজিতান্ত্রিক নিপীড়নের জোয়াল-বাঁধা জাতিগুলির বোঝা হালকা করে দেবে। আমি মনে করি আমাদের পার্টি সেই আশা পূরণ করেছে—বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, যখন জার্মান ও জাপ ফ্যাসিষ্ট অনাচার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ফ্যাসিষ্ট দাসত্বের সঙ্কট থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার জাতিগুলিকে রক্ষা করেছে। (তুমুল হর্ষধ্বনি)

অবশ্য যতদিন পর্য্যন্ত ঐ "বজ্র-বাহিনী" ঐ জাতীয় একমাত্র বাহিনী ছিল, যতদিন পর্য্যন্ত তাকে একাই ঐ অগ্রণীর ভূমিকার দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়েছিল, ততকাল এই সম্মানের ভূমিকা ছিল বড়ই কঠিন কাজ। কিন্তু অবস্থা ছিল তাই। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। আজ চীন ও কোরিয়া থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারী পর্য্যন্ত লোকায়ত্ত গণতন্ত্রের রূপে দেখা দিয়েছে নতুন নতুন "বজ্র-বাহিনী"। সুতরাং আমাদের পার্টির সংগ্রাম এখন আগের তুলনায় সহজ হয়েছে, কাজ এগিয়ে চলেছে আরো প্রবলতর (তুমুল দীর্ঘ হর্ষধ্বনি)।

বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে সেই সব কমিউনিষ্ট, গণতান্ত্রিক বা শ্রমিক ও কৃষক পার্টিগুলির দিকে যারা এখনো ক্ষমতার বলগা হাতে পায় নি, এখনো যারা কঠোর কঠিন বুর্জোয়া বিধানের পদতলে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য তাদের কাজ আরো কঠিন। তবু এদের কাজ ততখানি কঠিন নয় যতখানি কঠিন ছিল জার আমলে আমাদের কাজ, রুশ কমিউনিষ্টদের কাজ। জার আমলে সামান্যতম অগ্রগতির আন্দো-লনও ঘোরতর অপরাধ বলে ঘোষিত হত। কিন্তু রুশ কমিউনিষ্টরা সেই সব অসুবিধা সহ্য করে; সেই সব বাধার দ্বারা ভীতিগ্রস্ত না হয়ে পরিশেষে জয়লাভ করেছিল। ঐ সব পার্টিও তাই করতে পারবে।

জার আমলের রুশ কমিউনিষ্টদের তুলনায় ঐ সব পার্টির কাজ কম কঠিন কেন?

কারণ, প্রথমত, তাদের সামনে আছে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ও জনগণতন্ত্রগুলির সংগ্রামের ও সাফল্যের দৃষ্টান্তগুলি। ফলে তারা এই সব দেশের ভুলভ্রান্তি ও সাফল্য থেকে শিক্ষা লাভ করে নিজেদের কাজ সহজ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি আন্দোলনের প্রধান শত্রু বুর্জোয়া শ্রেণী স্বয়ং অন্য রকম হয়েছে, অনেকখানি বদলে গিয়েছে, আরো বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে, জন-সাধারণের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলেছে। স্বভাবতই এরূপ অবস্থায় বিপ্লবী ও গণতন্ত্রী পার্টিগুলির কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ না হয়ে পারে না।

পূর্বে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদেরকে উদার-নীতির ভাবধারায় অবগাহন করতে দিয়েছিল, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সমর্থক ছিল বলে জনগণের মধ্যে নিজেদেরও জনপ্রিয় করতে পেরে ছিল। সেই উদার মনোভাবের বাষ্পটুকুও আজ নেই। সেই তথাকথিত "ব্যষ্টির স্বাধীনতার" কোন অস্তিত্ব আর নেই। ব্যষ্টির অধিকারগুলি আজ কেবল তাদেরই জন্য যাদের আছে মূলধন এবং আর সব নাগরিককে গণ্য করা হয় কেবলমাত্র শোষণ-যোগ্য মানবীয় কাঁচা-মাল হিসেবে। জনগণ ও জাতিসমূহের সমানাধিকারের নীতি আজ পদদলিত। তার স্থান নিয়েছে শোষক সংখ্যালঘুর পূর্ণ অধিকারের নীতি এবং শোষিত সংখ্যাগুরুর কোনো অধিকার না থাকার নীতি। উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা। আমি মনে করি আপনাদেরই—কমিউনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদেরই—ঐ পতাকা তুলে নিয়ে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যদি অধিকাংশ জনসাধারণকে আপনাদের চারিপাশে সমবেত করার সঙ্কল্প আপনাদের থাকে। ঐ পতাকা তুলে ধরবার লোক আর কেউ নেই। (তুমুল হর্ষধ্বনি।)

পূর্বে বুর্জোয়াদের মনে করা হত জাতির মাথা। জাতির অধিকার ও স্বাধী-নতার সমর্থক ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। তাদের কাছে "আর সব বিষয়ের" উপরে ছিল ঐ অধিকার ও স্বাধীনতা। আজ "জাতীয় নীতির" এতটুকু চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। আজ ডলারের বিনিময়ে বুর্জোয়ারা জাতির অধিকার ও স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্ব-ভৌমত্বের পতাকা যখন ধূলায় লুটায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনাদেরই—কমিউনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির প্রতি-নিধিদেরই ঐ পতাকা উর্দ্ধে তুলে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে, যদি আপনাদের দেশভক্ত হতে হয়, যদি জাতির নায়ক ও পরিচালক হবার বাসনা আপনাদের থাকে। ঐ পতাকা উঁচুতে তুলে ধরবার আর কেউ নেই। (তুমুল হর্ষধ্বনি।)

বর্তমানে এই হচ্ছে পরিস্থিতি।

স্বভাবতই, যে সব কমিউনিষ্ট ও গণতন্ত্রী পার্টি এখনো শাসন ক্ষমতা হাতে পায়নি এই অবস্থা তাদের কাজের পথ সহজ ও সুগম করবে।

ফলত, পুঁজিবাদ-কবলিত দেশগুলির ভ্রাতৃস্থানিয় পার্টিগুলির সাফল্য ও জয়লাভের সম্পর্কে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। (তুমুল হর্ষধ্বনি)

আমাদের সৌভ্রাত্রমূলক পার্টিগুলি দীর্ঘায়ু হক। (দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি)

সৌভ্রাত্রমূলক পার্টিগুলির নেতাদের দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য কামনা করি। (দীর্ঘ স্থায়ী হর্ষধ্বনি)

জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি দীর্ঘায়ু হক! (দীর্ঘ স্থায়ী করতালিধ্বনি)

যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক। (সকলে দণ্ডায়মান হয়। প্রচণ্ড দীর্ঘ স্থায়ী হর্ষধ্বনি পরিণত হয় জয়ধ্বনিতে। আওয়াজ ওঠে: "কমরেড ষ্ট্যালিন দীর্ঘজীবি হউন!" "জয়তু কমরেড ষ্ট্যালিন!"

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, আইন সভার সদস্য ও সাধারণ নারীপুরুষ যাহারাই শান্তি রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবে তাহাদের এই মোর্চায় সংঘবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং শান্তি আন্দোলনের সংগঠনের রূপ হইবে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চা—সমস্ত রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তি, যাহারা শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে স্থায়ী শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। ইহাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা, ইহাকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চা হইতে ভিন্ন করা অথবা শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বকে উপেক্ষা করার অর্থ হইতেছে—শান্তি আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বোঝা। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিকে গ্রহণ না করিয়া ইহাকে দলীয় রূপ দেওয়ার অর্থ আন্দোলনকে দুর্বল করা। ইহাকে দলীয় ফ্রন্ট হিসাবে রূপ দেওয়া মানেই যুদ্ধবাজদের সহায়তা করিয়া শান্তি আন্দোলনের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা। এবং এই আন্দোলনে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বকে অস্বীকার করা মানেই ব্যক্তি-কেন্দ্রীক নেতৃত্বকে স্থাপন করা। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বুর্জোয়া নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা। সুতরাং ভারতের শান্তি আন্দোলন গণআন্দোলনেরই এক অপরিহার্য্য অংশ। জনস্বার্থ রক্ষার জন্য শান্তির স্বপক্ষে জনতার সক্রিয় আন্দোলন দূরে থাকুক এমনকি জনসাধারণের কাছে এই বিষয়টি আমরা সঠিকভাবে তুলিয়া ধরিতেও অসমর্থ হইয়াছি। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে শান্তি আন্দোলনে শতকরা ৭৫ জন কৃষকের মধ্যে অতি নগন্য সংখ্যাই শান্তি আন্দোলনে আসিয়াছে এবং একমাত্র শ্রমিক-শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহনের মধ্যদিয়ে শান্তি আন্দোলন উন্নত হইতে পারে। কিন্তু আমরা শান্তি আন্দোলনের এই নির্ভীক সৈনিকদেরও শান্তি আন্দোলনে সমবেত করিতে সক্ষম হই নাই। তাই আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলন আজও সহর ও সহরতলীর পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজিবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরজন্য দায়ী শান্তি আন্দোলনের সাংগঠনিক চরিত্র ও নেতৃত্ব।

ভারতবর্ষে শান্তি আন্দোলনের ★ সংগঠন ★

সাম্যবাদীরাই ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রাণশক্তি। সুতরাং যুদ্ধবাজদের শক্তির বিরুদ্ধে স্থায়ী শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিভিন্ন শক্তিকে সুসংগঠিত করার দায়িত্ব তাহাদেরই। সাম্যবাদী ও শ্রমিক-শ্রেণীর দলসমূহের প্রধানকর্মসূচীই হইবে শান্তির আন্দোলন।

কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির দলীয় সংকীর্ণতার নীতি ভারতের শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে ব্যাহত করিয়াছে। রণদীভের আমলে যখন ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি শিশুসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা ও উগ্রবামপন্থার ফলে ব্যপক গণসংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখনই তাহারা তাহাদের দল ও দলের সমর্থক গুটি কয়েক সংগঠনকে লইয়া সারা ভারত শান্তি কংগ্রেস গঠন করিয়াছিল। এবং এইভাবে শান্তি আন্দোলনকে দলীয় ফ্রন্টে পরিণত করিয়াছিল। সেই সময় পেব্‌লো নেরুদা মারফৎ বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে আমরা আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলনের সঠিকরূপ কি হইবে তাহা জানাইয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে শান্তি আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়িয়া তোলা ও তাহা পরিচালনা করার সঠিক পথ কি তাহাও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। আমাদের প্রস্তাব ছিল—সমস্ত বামপন্থী দল, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গণসংগঠন, প্রভৃতি শান্তির প্রকৃত শক্তিদের প্রতিনিধি লইয়া একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা। এই প্রস্তুতি কমিটি লক্ষ লক্ষ শান্তিকামী জনতাকে সংহত করিয়া দেশব্যাপি আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সম্মেলনের মধ্য দিয়া একটি সংগঠন-এর প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাহারা ইহাতে কর্ণপাত করে নাই। উপরন্তু তাহাদের উগ্রবামপন্থী আন্দোলনের ফলে শান্তি আন্দোলন অনেকখানি ব্যাহত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সারা ভারত শান্তি কংগ্রেসে অবশ্য এই ত্রুটি অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছিল কিন্তু আবার ইহা দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী খাতে প্রবাহিত হইতে যাইতেছে।

শান্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে এই বাম ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলনকে অনেকটা দুর্বল করিয়াছে। সর্বভারতীয় শান্তি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ পণ্ডিত নেহরুকে 'শান্তির সৈনিক' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছে। পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহেরুর 'এটমবোমার মূর্তপ্রতীক' এই ঘোষণার জন্যই এই তথাকথিত নেতৃবৃন্দের এই উক্তি। এই ধরণের উক্তি বহু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাঁইরাও করিয়াছেন। যদি পণ্ডিত নেহরু শান্তির রক্ষক বলিয়া ঘোষিত হন তবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিরাও যুদ্ধবাজ বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। এই সমস্ত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট কাহারো কাহারো মতে ভারত সরকার ফ্যাসীবাদী ট্রুম্যান এটলী চক্রের ক্রীড়নক,—অপর একটি বিশ্বযুদ্ধের প্ররোচক, কিন্তু এই সরকারেরই প্রধানমন্ত্রী শান্তির রক্ষক। অপরূপ যুক্তি! ইহার চাইতে জঘন্যতম কোন যুক্তিই হইতে পারে না। নেহেরু আর তাহার নীতির মধ্যে কোন পার্থক্যই টানা যায় না। সমস্ত দুনিয়ার কাছেই ইহা পরিস্কার, যে—ভারত সরকার ষ্টার্লিং ডলার সাম্রাজ্যবাদের সহিত গাঁটছড়া বাঁধা। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামরিক—প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইহা জনতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজদের শিবিরের সহিত মিতালী করিয়াছে। সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিটি লোকের কাছেই ইহা স্পষ্টভাবে ধরা দিয়াছে যে বর্তমান সরকারের প্রভিভূ নেহেরু কখনই শান্তির সমর্থক হইতে পারে না পরন্তু তাহার সমস্ত উদ্যম ও শক্তি শান্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাইতে বাধ্য। শান্তিপ্রিয় জনতার মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া তাহাদের আয়ত্বাধীন করার উদ্দেশ্যেই নেহরুজী এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এবং সারা ভারত শান্তি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নেহরুর পক্ষে প্রচার করিয়া নিজেদের আন্দোলনকেই ছুরিকাঘাত করিতেছে।

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির উনবিংশ পার্টি কংগ্রেসকে অভিনন্দন

নভেম্বর বিপ্লবের দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির ঐতিহাসিক উনবিংশ পার্টি কংগ্রেসকে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটি বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইয়াছে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর দল এস, ইউ, সি, আই, সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র স্থাপনে সার্থক রুশ শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার জন্য, সারা পৃথিবীর মেহনতী জন সাধারণের মুক্তি পথ প্রদর্শক, বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত হিসাবে দুনিয়ার প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক দুর্গের রক্ষক সোভিয়েট উইনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টিকে মুষ্টিবদ্ধ লাল সেলাম জানায়।

● ভারতে শান্তি-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ●

শান্তি আপনা হইতেই আসিবে না—তাহা অর্জন করিতে হইবে। শান্তির বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সহিত শান্তির সপক্ষ-সংস্কৃতির বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ভারতের শান্তি আন্দোলন উন্নত হইতে পারে।

জনসাধারণের মুল বক্তব্যকে তুলে ধরাই যে কোন প্রগতিশীল শিল্প, সাহিত্য বা দর্শনের সজীবতার লক্ষণ। জনতার স্বার্থ-রক্ষা করা ছাড়া ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই। শিল্প কলা সমগ্র সমাজের সম্পদ—ইহা ধনিকশ্রেণী বা বুদ্ধিজীবিদের এক-চেটিয়া সম্পদ নয়। কাজেই শিল্প, সাহিত্য বা দর্শনের মুলদায়িত্ব হইল জনতাকে সঠিক-ভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা, তাহাদের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা এবং সর্বপ্রকার বাধাকে নির্ভীকভাবে অতিক্রম করার মত প্রস্তুত করা। যে সব সাংস্কৃতিক কর্মী নিজেদের শান্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বলিয়া মনে করেন তাহাদের যত কিছু অসাড়, হতাশা ব্যঞ্জক বা এককথায় যে সব চিন্তা জনতার স্বার্থপরিপন্থী তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। শিল্প সাহিত্যের নিরপেক্ষতা নামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধনতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থকে যাহারা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু জনতার রাজনীতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকিলে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হইবে না। এবং সুধু এই জন্যই রাজনীতিহীন কলা প্রচার জনস্বার্থ পরিপন্থী। "শিল্পের জন্যই শিল্প" এই মতবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে পুজীবাদীরা তাহাদের শ্রেণীগত চিন্তাকে কায়েম করিয়াছে এবং যখনই কোন শিল্পী বা সাহিত্যিক নুতন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া জনতার স্বার্থে ঐ সব "তথাকথিত অরাজনৈতিক শিল্পের" মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছে তখনই সমস্ত বুর্জোয়া প্রেস তাহাকে বিশেষ রাজনৈতিক প্রচার বলিয়া জনতার সামনে শিল্প হিসাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছে। আজ ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, যুদ্ধবাজরাই নিরপেক্ষতা ও পবিত্রতার দোহাই দিয়া সাহিত্য ও শিল্পকে রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। আমরা শান্তি-সংস্কৃতি কর্মী, আমাদের দায়িত্ব হইতেছে শান্তিরক্ষা করা। 'শান্তি' একটি সুনির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ বা বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়। ইহা প্রকৃত পক্ষে এমন একটি চিন্তাধারা যাহা যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্ররোচনাকে প্রতিরোধ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। যুদ্ধের বিরোধীতা করা যদি রাজনীতি হয়, তবে ইহাও রাজনীতি। কাজেই শান্তি সংস্কৃতি কর্মীরাও রাজনীতির

উন্নত [illegible] আন্দোলনের [illegible] সৈনিক [illegible] শান্তির [illegible]। আমরা সাহসের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে—আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে নয়—জনগণের দৃষ্টিকে আরও সচেতন করার জন্য যাহাতে তাহারা সতর্কতা ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ প্ররোচকদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে পারে। কিন্তু ভারতের শান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে কোনরূপ দৃষ্টি দেন নাই পরন্তু ইহার বিপরীত আচরণ করিয়াছেন। ইহার প্রমান, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত গত সারাভারত শান্তি সংস্কৃতি সম্মিলনে নেতৃবৃন্দ "শান্তি সংস্কৃতি আন্দোলন রাজনীতির সহিত যুক্ত কিনা" —এই বিষয়ে আলোচনা পর্য্যন্ত করিতে দেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহিত শান্তির কি সম্পর্ক তার সঠিক উপলব্ধির অভাব পুরামাত্রায় বিদ্যমান। শান্তিকে কখনই Pacifismএর সহিত গুলাইয়া ফেলা উচিত নয়। আমরা তথাকথিত "শান্তিবাদী" নই, আমরা শান্তির সৈনিক। "শান্তিবাদী"দের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের ভেতরেই শান্তি আন্দোলন গড়ে উঠবে। এবং এই তথাকথিত "শান্তিবাদী" আদর্শকে চুর্ণবিচুর্ণ না করিলে প্রকৃত শান্তি আন্দোলনে সাফল্য আসিবে না। Pacifism বুর্জোয়া দর্শন হইতে উদ্ভূত ও পুষ্ট। ইহা শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত ও নিপীড়িত জনতার বৈপ্লবিক শক্তিকে দুর্বল করিয়া নির্বিবাদে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণকে কায়েম রাখিতে সহায়তা করে। যুদ্ধবাজরা যখন সমরায়োজনে সুসজ্জিত এবং শান্তিপ্রিয় জনতা সুসংহত নয় তখন যে সংস্কৃতি "শান্তি" বা "সহনশীলতার" কথা বলে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব তথাকথিত শব্দের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অভিপ্রায় চরিতার্থ করা। শক্তিকে দিয়াই শক্তিকে প্রতিহত করিতে হয়। Pacifism শোষক ও শাসক গোষ্ঠিকে নিশ্চিন্ত করিয়া জনতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কামানের খোরাক হইতে সহায়তা করে। Cosmopolitanism, Existentialism Gandhism অথবা যে নামেই দেওয়া যাক না এই সব Pacifist দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জনতার সংগ্রামী শক্তিকে দুর্বল করা এবং ইহার সতর্কতাকে মন্দীভূত করিয়া যুদ্ধের আগুন জ্বালাইয়া ফেলা। অতএব শান্তির সৈনিকদের বিশেষ করিয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন যাহাদের উপর নির্ভর করে জনতাকে সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের দ্বারা শিক্ষিত ও সংহত করাই তাহাদের দায়িত্ব। Pacifismএর সর্বপ্রকার বিভ্রান্তিকে দূর করিয়া ইহার শ্রেণী সম্পর্ক খুলিয়া ধরিতে হইবে। সারাভারত শান্তি সাংস্কৃতি সম্মেলন ইহা দূর করার চেষ্টা দূরে থাকুক, সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতীয় শান্তির ধারা ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে তুলিয়া ধরিতে গিয়া এই বিভ্রান্তি মারাত্মকভাবে দেখা দিয়াছে। "শান্তির" প্রসঙ্গে নিস্ক্রিয়তাবাদী দর্শনের যেমন কোন সম্পর্ক নাই তেমনি "পরলোকের-শান্তি" এই আধিভৌতিক দর্শনের সঙ্গেও এর কোন যোগাযোগ নেই। আমাদের শান্তি—এই জগতের শান্তি অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মুক্তি এবং তারই মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতি। শান্তির এই ধারনার সহিত বুদ্ধ, চৈতন্য, কবির, নানক ও অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের প্রচারিত শান্তি অথাৎ Pacivityর কোন সম্পর্কই নাই। এই সব চিন্তাশীলদের মূল বক্তব্য হইল "মন বস্তুর উর্দ্ধে"। তাহাদের মতে মনের স্বাধীন [illegible] হইতে স্বতন্ত্র কর্মদক্ষতা ও [illegible] সুতরাং তাহারা জনতাকে [illegible] প্রকৃত শত্রুর [illegible] করিয়া "প্রকৃত শান্তি" [illegible] করার জন্য একাগ্র চিত্তে [illegible] আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। [illegible] বিশেষের মনের এইরূপ [illegible] শান্তি আন্দোলনের [illegible] শোষণের সর্বরোগহর [illegible] ব্যবস্থা করেন, তবে তাহা [illegible] অপরাধ। এই সব দর্শনের [illegible] দিলেই তাহা শান্তির দর্শন হয়ে [illegible] নতুন ব্যাখ্যা দ্বারা মূল চিন্তাকে পরিবর্তন করা যায় না। আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়া, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ বিজ্ঞানকে অনুশীলন করিতে হইবে। কি ভাবে সমাজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় কি ভাবেই বা মানবজাতি এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হয়ে সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে শেষ আঘাত হানিবে, তাহা জনসাধারণকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইতে হইবে এবং শান্তি সংস্কৃতি কর্মীদের ইহাই করিতে হইবে। বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ও অপরাপর সংস্কৃতি আমাদের মর্মে সদিচ্ছাই জাগায় মাত্র—আর কিছুই নয়। বর্তমানে ইহাকে পুনরুজ্জীবীত করার চেষ্টা জনস্বার্থের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। শান্তি কখনো ছল দ্বারা নিশ্চিন্ত করা যায় না ইহা স্থাপন করার একমাত্র পথ হইতেছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্যাগুলি দেখার মারফৎ, বুর্জোয়াদের সৃষ্ট সর্বপ্রকার বিভ্রান্তিকে জ্ঞানতত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিহত করার এবং যুদ্ধবাদীদের আক্রমণাত্মক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শান্তিকামী শক্তির সংঘবদ্ধ আঘাতে। তবেই জাতিতে জাতিতে স্থায়ী শান্তি থাকা সম্ভব। সারা ভারত শান্তি কংগ্রেস কিন্তু এই বৈরাগ্য দর্শনকেই স্তুতিগান করিয়াছে।

শান্তি সংস্কৃতি ফ্রন্ট কি শুধু এই উপরোক্ত মতবাদে বিশ্বাসীদের নিয়েই গঠিত হইবে? না—নিশ্চয়ই নয়। যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে প্রতিরোধ করার জন্য শান্তির প্রকৃত সমর্থকদের—তাহারা যে কোন মতেরই হউন—একটি ব্যাপক গণমোর্চায় সংহত করাই আজকের দিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এই সমস্ত দোদুল্যমান ব্যক্তি, যাহাদের শান্তি আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা নাই তাহাদের হাতে শান্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকিতে পারে না। সারা ভারত শান্তি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইহাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন।

শান্তি আন্দোলনের সংগঠন ও রণকৌশল

সাম্রাজ্যবাদী চক্র শান্তি ও স্বাধীনতা বলিতে মনে করে—সারা পৃথিবীব্যাপী জনতার রক্তশোষণের অবাধ স্বাধীনতা আর পৌনঃপুনিকভাবে লুণ্ঠনে সেই নির্বাধতা মেনে নেওয়া। প্রকৃত শান্তি—নির্বানের শান্তি। কোন দেশ প্রেমিকই এই শান্তিতে সায় দিতে পারে না। সুতরাং জনতার শান্তির অর্থ—ধনিকদের এই শোষণ ব্যবস্থাকে বজায় রাখা নয়। শান্তির আন্দোলন এমন একটি আন্দোলন যাহার উদ্দেশ্য আগামী বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিহত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে যে কোন অজুহাতে এক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রোধ করা। তাই শান্তির আন্দোলন হইতেছে যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে—স্থায়ী শান্তি, পূর্ণজাতীয় স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য যদিও এক তবুও বিভিন্ন দেশের বাস্তব অবস্থার উপর ইহার রূপও ভিন্ন হইতে বাধ্য। শান্তির জন্য গণআন্দোলনের ব্যাপক ও নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের শান্তি আন্দোলনের বর্তমান নেতৃবৃন্দ ইহাকে অন্যভাবে মনে করেন। পঞ্চশক্তি শান্তি চুক্তির আবেদনপত্রে সহি সংগ্রহ ও বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করার মধ্যেই তাহাদের কাজ সীমাবদ্ধ। একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে জনতার সংগ্রামে আসা ও তাহাদের শান্তি শিবিরএ আসিতে এইগুলি সহায়তা করে মাত্র।

আজ শান্তি আন্দোলনই হইতেছে জনতার বিভিন্ন দাবীদাওয়ার আন্দোলনের মুকুরস্বরূপ। কারণ ইহাতে জনতাকে তাহার জীবন [illegible] মুক্তি ও বাঁচিয়া থাকার সংগ্রামের সহিত কিভাবে [illegible] জড়িত তাহা [illegible] হইবে। এইভাবে জনগণের শান্তির সংগ্রামের সহিত যুক্ত হইবে। প্রকৃত গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়াই শান্তির আন্দোলন জীবন্ত হইয়া উঠিবে অন্যথায় যে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ হইতেছে তাহার ফলে জনসংযোগ হারাইয়া প্রাণহীন হইয়া পড়িবে।

এই আন্দোলনের রূপ দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার শান্তি আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। কোরিয়ার জনতার সাহায্যে প্রজাতন্ত্রী চীনের স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ শান্তি রক্ষার শ্রেষ্ঠ রূপ। ইন্দোনেশীয়া, মালয় ও ভীয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যেমন নিঃসন্দেহে শান্তির আন্দোলন, তেমনি কোরিয়ার জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামও শান্তির আন্দোলন। এবং আবেদন; প্রতিবাদ ও জনপ্রিয় রেফারেণ্ডাম দ্বারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইটালী ও ফরাসী দেশে জনসাধারণকে যেভাবে সংহত করা হইতেছে তাহাও শান্তির আন্দোলন। বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার উপর আন্দোলনের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধ্য। যুদ্ধ [illegible] জনতাকে সংহত করাই ভারতবর্ষের সমস্যা। এবং এই আন্দোলন এমন ভাবে সংগঠিত করিতে হইবে যে, যদি জনতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বা তাহার তাঁবেদার শক্তি [illegible] আর একটি অন্যায় যুদ্ধের বোঝা চাপাইয়া দেয় তবে জনতা তার সংঘশক্তি দিয়া ঐ যুদ্ধের মারফৎ সাম্রাজ্যবাদীদের চীরতরে খতম করিয়া যুদ্ধকে পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া দিবে।

যদি শান্তি আন্দোলন এই পদ্ধতি করিতে হয়, তবে শান্তি আন্দোলনের মোর্চা এমন সুশৃঙ্খল হইবে যাহা কোন শৃঙ্খলাভঙ্গকারী বা ব্যক্তি, সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত আপোষহীনভাবে কাজ করিয়া যাইবে। "Laissez Faire" নীতি কখনো গ্রহণ করা চলিতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে এই সব নীতি চলিতে সাহায্য করা হইতেছে।

কমরেডগণ, আপনাদের নিকট আমাদের আন্তরিক আবেদন—আপনারা এই সমস্ত বিভ্রান্তিকে দুর করিয়া শান্তি আন্দোলনের পরিস্কার দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপন করুন। আমরা আমাদের দেশের শান্তির সৈনিকদের পক্ষ হইতে দৃঢ়তার সহিত ঘোষনা করিতেছি যে, তাহারা কখনও এই যুগের গুরুদায়িত্ব—যে কোন উপায়ে যুদ্ধকে প্রতিরোধ করিতে পশ্চাদ পদ হইবে না।

বিশ্ব শান্তি দীর্ঘজীবী হউক।

দুনিয়ার শান্তিকামী শক্তি সমূহের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম দীর্ঘজীবি হউক।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ্র কর্তৃক ২৩, ডিকসন লেন পরিবেষক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।